বিজ্ঞান: রান্নাঘরে, জাদুঘরে

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

বিজ্ঞান : রান্নাঘরে, জাদুঘরে

আমাদের প্রকাশিত লেখকের বই

পরিবেশ ও নগর জীবন
রাতভর সূর্য
বিজ্ঞান : রান্নাঘরে, জাদুঘরে
এই পথ, এই জাহাজ, শকট

বিজ্ঞান : রান্নাঘরে, জাদুঘরে

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সূচিপত্র

অদৃশ্য লিপি ৭
কেমন করে এলো : খাদ্য সংরক্ষণ ১০
খাদ্যের টিনজাতকরণ ১২
রেফ্রিজারেটর কিভাবে কাজ করে ১৫
শব্দ চালিত ফ্রিজ : পরিবেশের প্রয়োজনে নতুন প্রযুক্তি ১৮
বাড়িতে রসায়ন ২০
মাইক্রোওয়েভ চুলা : এখন রসায়নের রান্নায় ২৪
পেঁয়াজ রসুনের বিজ্ঞান ২৯
খাবারে মেশাল : ভাল মন্দ ৩২
রান্নার গুণে খাবারের স্বাদ ৩৮
ঘ্রাণং অর্ধ ... ৪০
টেস্টিং সল্ট কাহিনী ৪২
রান্নার রসায়নে ভালমন্দ ৪৪
রান্নাঘরের বিজ্ঞান ৪৬
দুধের বিজ্ঞান ৫০
পনির ৫৩
চা স্পৃহা চঞ্চল ৫৫
চায়ের কাপে তুফান ৫৮
আম : আন্তর্জাতিক ৬২
মাছ ধরার কাহিনী ৬৫
সাগর সিঞ্চনে ৬৮
মিষ্টি মুখ অনেক দুখ ৭৭
পুরানো নিদর্শন থেকে ইতিহাস ৮০
কেমন করে জানলাম ৮৫
আয়রন ব্রিজ : শিল্প বিপ্লবের আতুড় ঘর ৮৭
পৃথিবীর ওজন যিনি নিয়েছিলেন ৯০
মিশরের মমি ৯২
হিউরেকা : অনন্য এক বিজ্ঞান যাদুঘর ৯৫
অন্যরকম কিছু যাদুঘর ৯৭
প্রাচীন নিদর্শনের আসল নকল ১০৩
জামদানী ১০৬
জিন ব্যাংক : বৈচিত্র্যেই নিরাপত্তা ১০৯



অদৃশ্য লিপি

গোয়েন্দা কাহিনী তো তোমাদের খুব প্রিয় জিনিস, তাই না? ও সব পড়তে পড়তে নিজেকেও যে কখনো কখনো ডাক সাইটে গোয়েন্দা মনে করেছো তা নয়। ও সব কাহিনীতে নিশ্চয়ই দেখেছ ওদের অনেক সাংকেতিক লিপিতে বা অদৃশ্য লিপিতে খবর আদান-প্রদান করতে হয়, যাতে শত্রু পক্ষ বুঝতে না পারে। তা ছাড়া যুদ্ধের সময় এভাবে খবর আদান-প্রদানের দুঃসাহসিক কাহিনীর কথাও তোমরা পড়ে থাক। আমাদের মুক্তিযুদ্ধেইতো এমন কত করতে হয়েছে। ছোটবেলায় আমরা কিন্তু অন্য বন্ধুদের লুকিয়ে বিশেষ বন্ধুকে বিশেষ খবরটি জানাবার জন্য সহজ কিছু অদৃশ্য লিপি ব্যবহার করতাম। তোমরাও হয়ত কর, তবুও পাছে সহজ অদৃশ্য কালিগুলোর খবর তোমাদের সবার জানা না থাকে তাই সেগুলো জানিয়ে দিচ্ছি।

যে অদৃশ্য কালির কথা বলছি তার বেশির ভাগ উপাদান এই মুহূর্তে তোমার বাসাতেই আছে। তুমি ওগুলো নিয়ে কাজ করলে কোন সন্দেহই করবেনা যে তুমি গোপন লিপি তৈরির ফিকিরে আছ। একটি কালি হল লেবুর রস। আধখানা লেবু চিপে তার রস একটা পিরিচের উপর নিয়ে নাও। এটাকেই কালির সঙ্গে ব্যবহার করে লিখে যাও যা লেখার। শুকিয়ে গেলে কাগজের উপর এ লেখার কোন চিহ্নই থাকবে না। কমলালেবুর রস দিয়েও এই একই কালি হতে পারে।

আধ চামচ চিনি আধ কাপ পানিতে গুলে নিয়ে তৈরি হতে পারে আর একটা কালি। তেমনি আধ চামচ মধু আধ কাপ পানিতে গুলেও তা হতে পারে। বেটে নেয়া বা কুড়িয়ে নেয়া পেঁয়াজ থেকেও তৈরি হতে পারে অদৃশ্য কালি। বাটা বা কোরা পেঁয়াজ একটা পিরিচের উপর কিছুক্ষণ রেখে দাও। যে রস এটা থেকে বেরিয়ে আসবে তা দিয়েই লিখতে হবে। সেভেন আপ, কোকা-কোলা বা সোডা পানি জাতীয় পানীয়ও অদৃশ্য কালির কাজ করতে পারে। তবে সরাসরি যেগুলো দিয়ে লিখলে লেখা একটু

একটু দেখা যেতে পারে বলে এরকম এক দুই চামচ পানীয়ের সাথে এক চামচ পানি মিশিয়ে তারপর লেখো।



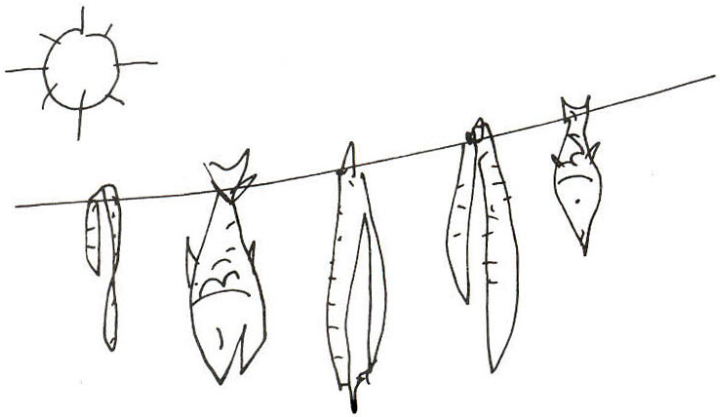
এখন কথা হল কি দিয়ে লিখবে, কিসের উপর লিখবে। সুঁচালো একটা কাঠিকেই তুমি কলম হিসেবে ব্যবহার করতে পার—দাঁতের খিলানই চমৎকার কলম হতে পারে। অবশ্য এরকম কাঠিতে বেশি কালি লেগে থাকবেনা বলে তোমাকে বারবার তা কালিতে ডোবাতে হবে। একটি হ্যান্ডেল কলম ব্যবহার করতে পারলে অবশ্য এই অসুবিধা থাকবে না। তাই বলে ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করতে যেওনা কিন্তু, যদি না সেটা পুরানো অকেজো পেন না হয়। কারণ এসব কালি নতুন কলম নষ্ট করে ফেলতে পারে।

যে কোন সাদা কাগজের উপর লিখতে পার। রুলটানা কাগজ হলে ভাল হয়। যে সব কালির কথা বললাম সেগুলো চট করে শুকিয়ে যায়, আর শুকিয়ে গেলে কোথায় লিখেছ তাও আর বোঝা যায় না, অদৃশ্য কালি যে! রুলটানা থাকলে অন্তত জানবে কোথায় লেখা হয়েছে। একই জায়গায় দু'বার লেখার ভয় থাকবে না। গোপনীয়তার খাতিরে তুমি আরো একটা কাজ করতে পার যাতে তোমার বন্ধুটি ছাড়া অন্যরা বিভ্রান্ত হবে। ফাঁক ফাঁক লাইন করে তুমি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক অন্য কোন কিছু লেখ সাধারণ কোন কালি দিয়ে। এবার আসল খবরটি ঐ লাইনগুলোর ফাঁকে ফাঁকে লেখ অদৃশ্য কালি দিয়ে। তোমার বন্ধুটি ঠিক জানবে আসল খবর কিভাবে পাঠোদ্ধার করতে হবে।



হ্যাঁ, এবার অদৃশ্য লিপি পড়ার প্রশ্নটি আসে। অল্প একটু তাপ লাগলেই অদৃশ্য লিপি দৃশ্য হয়ে ফুটে উঠবে। এটা নানাভাবে করা যায়। বৈদ্যুতিক টেবিল ল্যাম্পের জলন্ত বাল্বের উপর রেখে বা হারিকেনের চিমনীর উপর সেটে ধরে এটা করা যায়। পুরো কাগজটাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গরম করে নিতে হবে। লেখাটি ফুটে উঠবে ফিকা খয়েরী রঙের। রুটি সেঁকার তাওয়ার উপর খানিকক্ষণ রাখতে পার কাগজটা, অথবা কাপড়ের ইস্ত্রি দিয়েও গরম করতে পার একে। অবশ্য যেভাবেই গরম কর লক্ষ্য রাখবে যাতে অতিরিক্ত স্যাঁকা লেগে কাগজটাই খয়েরী হয়ে না যায়, তা হলে তোমার লিপি পড়া আর হবে না।





কেমন করে এলো খাদ্য সংরক্ষণ

খাদ্য সংরক্ষণের চেষ্টা মানুষের অতি প্রাচীন কাল থেকেই। গুহাবাসী যে মানুষ পশু শিকার করতো অথবা খাদ্য কুড়িয়ে আনত, ক্ষুধা পেলেই যে খাদ্য তার মিলবে এমন নিশ্চয়তা ছিল না। তাই তাকেও যথাসাধ্য খাদ্য জমাবার চেষ্টা করতে হতো। খুব সম্ভব ফল-মূল-শস্য অথবা মাছ-মাংস রোদে শুকিয়ে এটি সে করতো। কোন কোন খাদ্য গুহার ভেতরে ঠাণ্ডা, শুকনা জায়গায়ও জমিয়ে রাখতো। আগুন আবিষ্কারের পর আগুনে দ্রুত শুকিয়ে অথবা ধোঁয়া দিয়ে খাদ্য সংরক্ষণের উপায় উদ্ভাবিত হয়।

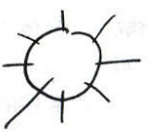
রোম সাম্রাজ্যের বিস্তারের পর রোমান ধনী ব্যক্তিরা উপযুক্ত জায়গা থেকে বরফ ও তুষার আমদানি করতো খাদ্যকে ঠাণ্ডায় রেখে সংরক্ষিত করার জন্য। প্রাচীন ভারতে, চীনে মশলা ও চিনি সহযোগে খাদ্যকে দীর্ঘস্থায়ী করার কৌশল জানা ছিল। আমেরিকায় প্রথম দিকে যে সব ইউরোপীয়রা বসতি স্থাপন করে তাদের মধ্যে ধোঁয়া দিয়ে অথবা সিরকা ও লবণ সহযোগে আচার বানিয়ে বহু দিন ধরে খাবার জমিয়ে রাখার নিয়ম প্রচলিত ছিল।

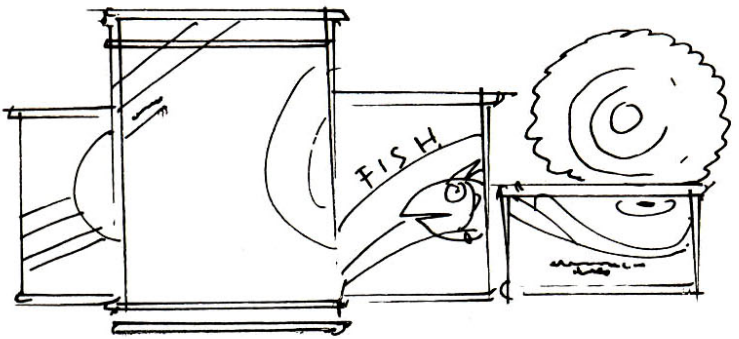
আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণবিদ্যা জীবাণু তত্ত্বের অগ্রগতির সঙ্গে সম্পর্কিত। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে হল্যান্ডের বিজ্ঞানী আন্তন ভ্যান লাভেন হুক প্রথম তাঁর অণুবীক্ষণে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুগুলো লক্ষ্য করেন এবং এদের ছবি আঁকেন। ১৭৬৫ সালে ইতালীয় প্রকৃতিবিদ ল্যাজারো স্প্যালানজানী দেখান যে জীবাণুগুলো আপনা-আপনি সৃষ্টি হয় না, অন্য জীবের মত বংশ বৃদ্ধি করে। ১৮৫০-এর দিকে ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর প্রমাণ করেন যে, কোন কোন জীবাণু যদিও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সাহায্য করে যেমন দৈ তৈরিতে, তেমনি দুধ প্রভৃতি পানীয়ের নষ্ট হবার পেছনেও জীবাণুই দায়ী।

১৭৯৫ সালে ফ্রান্সে লিকোনাস এপার্টের খাদ্য বোতলজাতকরণ উদ্ভাবনের মাধ্যমেই আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণ কৌশলের যাত্রা শুরু হয়। তিনি কিছুটা রান্না করা খাদ্য বোতলে সীল করে তা আবার ফুটন্ত পানিতে উত্তপ্ত করে নেন। এই পদ্ধতি দ্রুত বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করে। ১৮২০-এর দিকে সংরক্ষণের জন্য ধাতুর কৌটার ব্যবহার প্রচলন হয়। ১৮২৫ সালে আমেরিকার টমাস কেনসেট লোহার উপর টিনের পাতলা পর্দা দিয়ে এর কৌটায় খাদ্য সংরক্ষণের উপায় উদ্ভাবন করেন। এই কৌটাগুলোই পরে শুধু টিন বলেই পরিচিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি খাদ্য সরবরাহের জন্য বরফ দিয়ে শীতলীকৃত গাড়ির ব্যবহার শুরু হয়। ঐ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্যবসায়িকভাবে যন্ত্রের সাহায্যে খাদ্য হিমায়ন শুরু হয় বটে তবে বাসায় সাধারণত আইস বক্স অর্থাৎ বরফ দেয়া বাক্সে খাবার ঠাণ্ডা রাখা হতো। ঘরে রেফ্রিজারেটর ব্যবহার চালু হয় ১৯২০-এর দিকে প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রে।

প্রথম দিকে খাদ্য হিমায়নের সময় ধীর গতিতে হিমায়িত করতে হতো। এতে খাদ্যের মানে অবনতি ঘটতো। এ শতাব্দীর বিশের দশকে ক্লারেন্স বার্ডসাই দ্রুত হিমায়নের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। দ্রুত হিমায়নের ফলে খাদ্যের জীবকোষের ভেতরে জলীয় অংশ বড় কেলাসে না জমে ছোট কেলাসে জমতে পার। এতে কোষ দেয়াল বিদীর্ণ হয়ে রস বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সৈনিকদের প্রয়োজনে শুষ্কায়িত খাদ্যের প্রচুর প্রয়োজন হয়। এ সময় যে গবেষণা হয় তারই ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে গুড়ো দুধ, ইনস্ট্যান্ট কফি ইত্যাদি জনপ্রিয় শুষ্কায়িত পানীয়ের প্রযুক্তিতে প্রচুর উন্নতি ঘটে।





খাদ্যের টিনজাতকরণ

আমাদের দেশে টিনজাত খাদ্যের প্রচলন বেশি নয়। কিন্তু টিনের খাবার আমাদের কাছে একেবারে অপরিচিতও নয়। আজকাল ভাবনা চিন্তা হচ্ছে মৌসুমী সব্জি ও ফল টিনজাত করে অন্য সময় পাওয়ার ব্যবস্থা করার এবং কিছু কিছু রফতানিও করার। মাছের, বিশেষ করে ইলিশ মাছের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। তাই খাদ্য টিনজাত করার প্রযুক্তিটি সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ থাকাটি স্বাভাবিক।

১৮০৯ সালে নিকোলাস এপার্ট নামে একজন ফরাসি বাবুর্চি প্রথম খাদ্য টিনজাত করার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন। দুটি বিষয়ের উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তা হলো—যে সব্জিকে টিনজাত করা হবে তা যেন টাটকা আর খুব পরিষ্কার হয় এবং সংরক্ষিত খাদ্যের সাথে কোন বাতাস যেন না থাকে। যদিও আরো পঞ্চাশ বছর পর লুই পাস্তুর বাতাসে রাখা বা অপরিষ্কার খাদ্যে জীবাণুর বিষক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলেন, এপার্টের পদ্ধতিতে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। এ পদ্ধতিতে খাদ্যকে একটি নির্দিষ্ট সময় উত্তপ্ত করে তা গরম অবস্থাতেই বোতলে সীল করে দেওয়া হতো। কত সময় উত্তপ্ত করা হবে তা বিভিন্ন খাদ্যের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারিত হতো। কিছুদিনের মধ্যেই বোতলের বদলে টিনের পাতের কৌটা ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হল।

এপার্টের আমল থেকে শুরু করে খাদ্য টিনজাত করার জনপ্রিয়তা এত বেড়ে গিয়েছে যে এখন কৌটাগুলো আর হাতে তৈরি ও ঝালাই করলে চলে না, এগুলো তৈরির ভার নিয়ে নিয়েছে অন্য বিশেষ শিল্প। এগুলোকে আমরা টিন বলি কিন্তু এর অধিকাংশই আসলে ইস্পাত। ইস্পাতের পাতলা পাতের উভয় তলে টিনের একটু প্রলেপ লাগিয়ে নেওয়া হয় বলেই পুরো জিনিসটাকে টিন বলা হয়। শুধু ইস্পাতে মরচে ধরার ও

খাদ্যকে দূষিত করার কারণ থাকে বলে টিনের এই প্রলেপ দেওয়া। টিন অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি দামী ধাতু। পুরো কৌটা টিনে তৈরি করা ব্যয়বহুল হবে। তথাকথিত টিনের বড় পাতকে সঠিক আকারে কেটে নিয়ে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে বেলনাকারে কৌটার বক্র অংশটি তৈরি হয়। একই সঙ্গে অন্য পাত থেকে চাকতির আকারের টুকরা কেটে নেওয়া হয় কৌটার তলা হিসেবে ব্যবহারের জন্য। এই তলার কিনারায় এমন খাঁজ থাকে এবং সেই খাঁজে এমন ঝালাই বস্তু দেওয়া থাকে যাতে সহজেই একে বায়ু নিরোধী করে জুড়ে দেওয়া যায়। এই অবস্থায় মুখ খোলা কৌটা পাঠিয়ে দেওয়া হয় খাদ্য টিনজাত করার কারখানায়।

বড় বড় টিনজাতকরণ কারখানার নিজস্ব শস্য বা সব্জি সংগ্রহ ব্যবস্থা থাকে। সেখান থেকে টিনজাতের জন্য আদর্শ অবস্থায় একে কারখানায় আনার চেষ্টা করা হয়। যত তাড়াতাড়ি টিনজাতকরণের প্রক্রিয়া শুরু করা যায় খাদ্যের স্বাভাবিক স্বাদ-গন্ধ বজায় রাখার দিক থেকে ততই ভাল। ধরা যাক, মটরশুঁটি টিনজাত করা হবে। তা হলে মাঠ থেকে আনা মটরশুঁটিকে দ্রুত ছিলে নিয়ে প্রক্রিয়াকরণ শুরু করতে হবে। এ প্রবন্ধের বাকি অংশে আমরা এই মটরশুঁটির টিনজাতকরণকেই উদাহরণ হিসেবে বেছে নেব। অবশ্য অন্যান্য সব্জি এবং কিছু কিছু ফলের ক্ষেত্রেও মোটামুটি এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

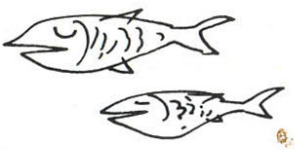
শুটি থেকে ছাড়াবার পর মটর দানাগুলোকে প্রবহমান পানির মধ্যে ধুয়ে নেওয়া হয় এবং দানার আকার গুণ অনুসারে বাছাই করা হয়। এরপর যে প্রক্রিয়া তার নাম ব্লাঞ্চিং। এর অর্থ ফুটন্ত পানিতে অথবা বাষ্পের ভাপে উত্তপ্ত করা। ব্লাঞ্চিং-এর দ্বারা সব্জির রং উন্নত হয় এবং একে স্পর্শে যে অনুভূতি হয় তাও অপেক্ষাকৃত ভাল হয়। এরপর কনভেয়ার বেল্টের উপর দানাগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে চোখে দেখে নিম্নমানের দানাগুলোকে হাতে বেছে ফেলা যায়।

এবার টিন ভর্তি করার পালা। এর আগে অবশ্য টিনগুলো বাষ্প আর পানি দিয়ে খুব ভাল করে ধুয়ে নেওয়া হয়। বড় একটি পাত্র থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ মটরশুঁটি টিনে পুরে দেওয়া হয়। টিনটিকে এখন কানায় কানায় লবণ পানি দিয়ে ভর্তি করা হয়। এর সাথে সামান্য চিনি এবং মিন্টের সুগন্ধিও থাকে। অবশ্য উত্তপ্ত করার সময় আয়তনে বেড়ে যাবার কথা খেয়াল রেখে সামান্য কিছু খালি জায়গা টিনে রাখা হয়। এখন এমন অবস্থায় টিনের মুখটি সীল করে দেওয়া হয় যাতে এর মধ্যে কোন বাতাস অবশিষ্ট না থাকে।

বায়ু নিরোধী টিনের ভেতর মটরশুঁটি বদ্ধ হয়ে গেল বটে কিন্তু তখনো এর মধ্যে জীবাণু থাকার সম্ভাবনা রয়েছে যা বিনষ্ট না করলে খাদ্য নিরাপদ থাকবে না। এজন্য বেশ কিছু মটরভর্তি টিনকে রাখা হয় বিরাট বিরাট সব প্রেশার-কুকারে। এতে উচ্চ চাপে বাষ্পের সহায়তায় খাদ্যকে ১১৫° সে. উত্তাপে নিয়ে ২০-৩০ মিনিট রাখা হয়। এর ফলে একদিকে মটরশুঁটি যে রকম রান্না হয়ে যায়, অন্যদিকে টিনের ভিতরটা ক্ষতিকর জীবাণু মুক্ত হয়। এর পর আর একটি ব্যবস্থায় টিনগুলোকে ঠাণ্ডা করে নেওয়া হয়।

টিনজাতকরণের জরুরি কাজগুলো এভাবে শেষ হয়ে গেলে টিনে লেবেলের কাগজ লাগানোর এবং একে বাক্সবন্দী করার কাজ শুরু হয়। যদিও গত শতাব্দীর প্রথম থেকেই খাদ্য টিনজাতকরণের কাজ চলে আসছে, তবুও এর উন্নয়নের জন্য গবেষণার আজও বিরাম নেই। বিভিন্ন খাদ্যের জন্য টিনজাতকরণের মূলনীতিটি সেই এপার্টের আমল থেকে খুব একটি পরিবর্তিত হয়নি। কিন্তু প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে উত্তাপ প্রয়োগের পরিমাণ, সময় পদ্ধতি ইত্যাদির সঠিক নিয়ন্ত্রণ করে খাদ্যের স্বাভাবিক স্বাদ-গন্ধ এবং পুষ্টি উপাদান আরো ভালভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হচ্ছে। এক সময় টিনজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায় হাতে করা হতো। এতে জীবাণুমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যাঘাত ঘটতো। আজকাল গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার উপর। এর ফলে বিপুল পরিমাণ খাদ্য নিখুঁতভাবে টিনজাত করা সম্ভব হচ্ছে।

আমাদের দেশেও কিছু কিছু খাদ্যের টিনজাতকরণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ইলিশ মাছ, আনারস ইত্যাদি কিছু সম্ভাবনাময় খাদ্যের টিনজাত করার দেশীয় প্রযুক্তি নির্ধারিতও হয়েছে। অবশ্য ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এখনো এগুলো তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। এখন বাধাগুলোর মধ্যে প্রযুক্তির চেয়ে উদ্যোগের অভাবটিই বেশি প্রকট হয়ে উঠছে। অথচ মৌসুমী খাদ্যগুলোকে উৎপাদন স্থানের কাছেই টিনজাত করার ব্যবস্থা করা গেলে এ সব মূল্যবান পুষ্টিসামগ্রী অপচয় বন্ধ হতো এবং বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনেরও একটি ভাল উপায় যোগ হতো।





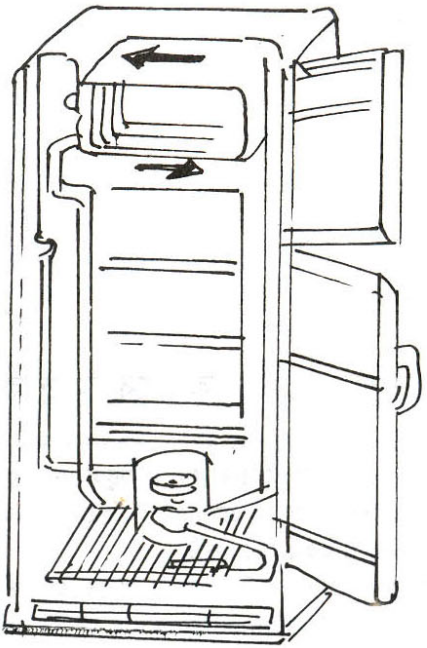
রেফ্রিজারেটর কিভাবে কাজ করে

এক বোতল পানীয় ফ্রিজের ভেতরে রাখা হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এটি চমৎকার ঠাণ্ডা হয়ে গেলো—তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। এতে আশ্চর্য হবার কি আছে—ফ্রিজের ভেতরটা যে খুব ঠাণ্ডা, কিছু রাখলে ও রকম তো হবেই।

এটা বলতে যে রকম সোজা রেফ্রিজারেটর অর্থাৎ হিমায়ক যন্ত্রের হিমায়ন পদ্ধতি কিন্তু ততটা সহজ নয়। একটা জটিল প্রক্রিয়ায় এই যন্ত্রটির ভেতরে ঠাণ্ডা তরল পদার্থ অতিমাত্রায় কম উত্তাপেও টগবগ করে ফোটে। এতে হিমায়ক যন্ত্রের ভেতরে চাপের তারতম্য হয় এবং এর ভেতরে রাখা যাবতীয় বস্তু যেমন : খাবারদাবার, পানীয়, সবকিছুই তাদের প্রাকৃতিক উত্তাপ হারিয়ে ফেলে।

তাহলে আমরা দেখি নিত্যব্যবহার্য একটা হিমায়ক যন্ত্রের ভিতরে কি কি আছে? এর ভিতরে আছে একটা বদ্ধ ফাঁপা নল—যেটা পুরো হিমায়ক যন্ত্রটিকে পেঁচিয়ে ঘুরে ঘুরে একই জায়গায় গিয়ে মিলেছে। এ নলটির মধ্য দিয়ে অনবরত প্রবাহিত হচ্ছে একটি রাসায়নিক (তরল) পদার্থ—যার নাম ফ্রিয়ন (Freon)। এই তরল পদার্থটি স্বভাবে একটু খামখেয়ালি বটে! অতিমাত্রায় উচ্চচাপে না রাখলে এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তুলনামূলকভাবে বেশ নিম্ন তাপেও চঞ্চল হয়ে উঠে, বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে চায়। কোন পদার্থকে তরল অবস্থা থেকে বাষ্পীয় অবস্থায় যেতে হলে এর অণুগুলোকে অতি দ্রুত চলাচল করতে হয়। এই গতিবেগ পাওয়ার জন্য এবং একে ত্বরান্বিত করতে হলে অবশ্যই যেটি প্রয়োজন সেটি হল উত্তাপ। এই উত্তাপ তাকে পেতে হবে বাইরে থেকে, তার আশেপাশের পরিবেশ থেকে। অর্থাৎ পদার্থটির অণুগুলোকে তাদের চারপাশ থেকে তাপ শোষণ করতে হয়। কাজেই হিমায়ক যন্ত্রের ভেতরে নলের মধ্যে ফ্রিয়নের চঞ্চল হবার জন্য চাই উত্তাপ। হিমায়ক যন্ত্রের যে বাক্স বা আলমারী সদৃশ অবয়ব তার

দেওয়ালটি তৈরি ভাল তাপ-নিরোধী বস্তু দিয়ে। বাইরের তাপ সহজে তাতে ঢুকতে পারে না। কাজেই ফ্রিয়ন বাক্সটির বাইরে থেকে এই তাপ শোষণ করতে পারে না। তা হলে এই তাপ আসবে কোত্থেকে?



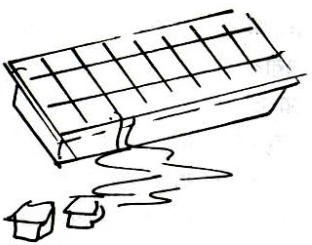
কেন? হিমায়ক যন্ত্রের ভেতর থেকে—ঐ যে এক বোতল পানি রাখা হল, তা থেকে—তাকে তাকে সাজানো সব খাবার দাবার থেকে, লেটুসের পাতা থেকে, পনির, দুধ, মাছ, মাংস, সব্জি সব থেকে। ফ্রিয়নকে এই তাপ সংগ্রহের জন্য অবশ্য এসব খাবার-দাবার স্পর্শ করতে হয় না—হিমায়ক যন্ত্রের গায়ে পেঁচানো নলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময়ই সে তার প্রয়োজনীয় তাপ এসব জিনিস থেকে শুষে নেয়।

তাপ শোষণের পর তরল ফ্রিয়ন এবার একটি বাষ্পীভবন কামরায় গিয়ে সেখানে অধিক জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে ফলে সঙ্গে সঙ্গে এর উপর চাপ কমে যায়। এই নিম্ন চাপের ফলে তরল ফ্রিয়ন এখানে বাষ্পীভূত হয়ে যায়। পরিভ্রমণরত ফ্রিয়ন গ্যাসকে এভাবে বেশিক্ষণ বাষ্পীয় অবস্থায় থাকতে দেয়া হয় না। ফ্রিয়ন অণুর ক্ষমতা অনুযায়ী তাপ শোষণ করার পর এই বাষ্প এবারে ঘনীভবনের কামরায় যায়। এখানে ফ্রিয়ন গ্যাসকে ছোট জায়গায় সংকুচিত করে তার উপর চাপ বাড়ানো হয়। উচ্চ চাপের ফলে ফ্রিয়ন অণু তার চাঞ্চল্য হারিয়ে ফেলে এবং ধীরে ধীরে পুনরায় তরলে পরিণত হয়। তরলীভূত হওয়ার সময় কিন্তু ঘটে উল্টো ঘটনা। কিছু তাপ তাকে এবার ছেড়ে দিতে

হয় বাইরে। ছেড়ে দেওয়া এই বাড়তি তাপটুকু যাতে বাক্সের একেবারে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া যায় সেরকম ব্যবস্থা থাকে। হিমায়ক যন্ত্রের পিছনে হাত দিলে এই তাপ অনুভব করা যায়।

এরপর আবার নতুন করে ফ্রিয়নের চক্র শুরু হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ ঠিক থাকে—ফ্রিয়নের এই পরিভ্রমণ চলতেই থাকে—তাপ নিয়ে বাষ্পীভূত হওয়া তারপর আবার ঘনীভূত হবার সময় সে তাপ ছেড়ে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কিন্তু হিমায়ক যন্ত্রে হিমায়ক হিসেবে ফ্রিয়ন ব্যবহার হতো না। যে সব রাসায়নিক তরল পদার্থ ব্যবহৃত হতো, সেগুলো হয় ছিল বিষাক্ত, নয় অতিমাত্রায় দাহ্য। ১৯৩০ সালে বিষক্রিয়াবিহীন, অদাহ্য এই ফ্রিয়ন উদ্ভাবন করেন টমাস মিডগুলি জুনিয়র নামে একজন রসায়নবিদ। এটি উদ্ভাবনের পর এর উপাদান এবং এর গুণগত মানের উপর তিনি এত আস্থাবান ছিলেন যে একে তিনি এক বিশাল দর্শক সমাবেশে উপস্থাপন করতে গিয়ে নিজেই নিশ্বাসের সঙ্গে এটি গ্রহণ করেন এবং মোমবাতির শিখায় প্রবাহিত করান। ফলাফল অত্যন্ত শুভ হওয়ায় এই ঘটনার কিছু কালের মধ্যেই পরিষ্কার এবং নিরাপদ এই ফ্রিয়ন-এর ব্যবহার হিমায়ক হিসেবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।





শব্দ চালিত ফ্রিজ : পরিবেশের প্রয়োজনে নতুন প্রযুক্তি

সাধারণ ফ্রিজ অথবা এয়ারকন্ডিশনার কাজ করে বিশেষ ধরনের গ্যাসকে মোটর চালিত পাম্পের সাহায্যে, একবার বায়বীয় বৃহৎ আয়তনে ছড়িয়ে দিয়ে তাপ শোষণের ব্যবস্থা করে এবং তারপর অন্যত্র নিয়ে তা সঙ্কুচিত করে যে তাপ পরিত্যাগ করিয়ে। পদ্ধতিটি সরল, কিন্তু পরিবেশের প্রতি বন্ধুসুলভ নয়, অন্তত বর্তমান অবস্থায়। ফ্রেয়ন ইত্যাদি যেসব গ্যাস এই কাজে ব্যবহৃত হয়, তা বায়ুমণ্ডলে যেতে পারলে উর্ধ্বাকাশে ওজোন স্তর ফুটো করে দিয়ে ক্ষতিকর আলট্রাভায়োলেটের সামনে আমাদেরকে অসহায়ভাবে উন্মুক্ত করে দিতে সাহায্য করে। এ সব গ্যাসের বৃহদাকার শিল্প এবং এদের ব্যাপক ব্যবহার এখন পরিবেশের প্রতি একটি বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রাসায়নিক শিল্প আজ অবধি এর বিকল্প নির্দোষ কোন গ্যাস ব্যবহারে ব্যর্থ হয়েছে।

এখন তাই ফ্রিজে হিমায়ন প্রক্রিয়ার জন্য নতুন পদ্ধতির কথা চিন্তা করা হচ্ছে যাতে ওসব গ্যাস ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না। পদ্ধতিটি খুবই অভিনব। মহাকাশে ওজনহীন অবস্থায় সাধারণ ফ্রিজের অসুবিধা বলেই এটি মূলত উদ্ভাবিত হয়েছে। তবে পরিবেশের কারণে পার্থিব ব্যবহারেও এর প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এটি হল শব্দ চালিত ফ্রিজ।

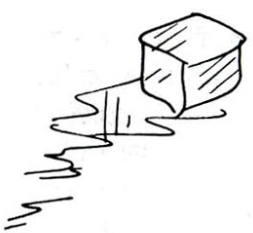
এই ফ্রিজের উপরে থাকা মূল অংশকে বলা যায় খুব বিশেষ ধরনের লাউডস্পীকার। এতে যে ইলেকট্রনিক পাল্‌স সরবরাহ করা হয় তার ফলে খুব শক্তিশালী শব্দ তৈরি হয়ে তা একটি নলের মধ্য দিয়ে নিচের দিকে অগ্রসর হয়। নলটি এমন অকম্পনশীলভাবে তৈরি যে শব্দ খুব জোরালো হলেও নলের বাইরে তা তেমন শোনা যায় না। নলের মধ্যে থাকে হিলিয়াম, জেনন বা আরগনের মত কোন একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস। তা ছাড়া এর মধ্যে থাকে ৮ সেন্টিমিটার প্রস্থ ও ৩ মিটার লম্বা প্লাস্টিকের ফিতা যা ভাঁজ করে গুটিয়ে

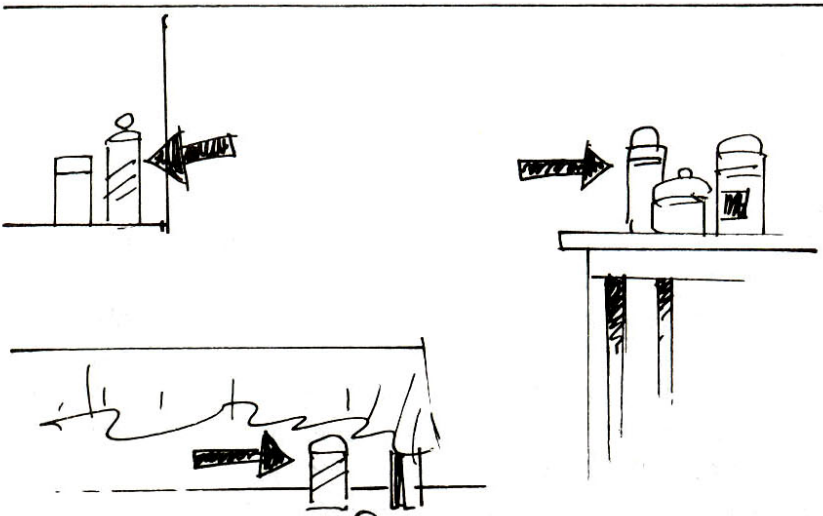
রাখা থাকে। ফিতার ভাঁজের পরতগুলোর মধ্যে সূতা দিয়ে খুব সামান্য ব্যবধান রাখা হয় যার মধ্য দিয়ে গ্যাসের অণু উপর-নিচ যাতায়াত করতে পারে।

গ্যাসের অণুগুলোকে সংকুচিত করা হলে তা উত্তপ্ত হয়, আবার এদের প্রসারিত করা হলে তা শীতল হয়। শব্দের অনুলম্ব তরঙ্গ নলের মধ্যে দিয়ে নিচের দিকে অগ্রসর হবার সময় গ্যাসের সংকোচন প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এর এক একটি পরমাণু উপর-নিচ আন্দোলিত হতে থাকে। ধরা যাক, বিশেষ উত্তাপের একটি পরমাণু একটি বিশেষ জায়গা থেকে আন্দোলন শুরু করল। শব্দ তরঙ্গ এর কাছে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে এটি উপরের দিকে সংকোচনের অবস্থায় গিয়ে উত্তপ্ত হল। এই উত্তাপের খানিকটা প্লাস্টিক ফিতার মধ্যে স্থানান্তরিত হল। পরবর্তী প্রসারণের পর্যায়ে পরমাণুটি তার আদি অবস্থান থেকে নিচে নেমে এসে শীতল হয়ে তার আদি উত্তাপের থেকেও কম উত্তাপে চলে আসলো। নিকটবর্তী প্লাস্টিক থেকে এটি তখন উত্তাপ গ্রহণ করবে এবং এর পর আদি অবস্থান ও উত্তাপে ফেরত যাবে। এভাবে একই কাজ এটি বারবার করতে থাকবে।

নলের মধ্যে প্লাস্টিক ফিতার ফাঁকে সব গ্যাস পরমাণুই এই একই রকম আচরণ করতে থাকবে—এবং এর সার্বিক ফলাফল হবে এগুলো উপরের প্লাস্টিকে তাপ ত্যাগ করবে আর নিচের প্লাস্টিক থেকে তাপ গ্রহণ করবে। এভাবে তাপ ক্রমে প্লাস্টিকের নিচের অংশ থেকে উপরের অংশে উঠে আসবে—নলটির তলার দিকটি ঠাণ্ডা হয়ে পড়বে।

এখনো যদিও এই নতুন ধরনের হিমায়ক বাজারে আসেনি, কিন্তু পরিবেশ সচেতনতার ফলে এর প্রতি প্রচুর আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভাবকরা আশা করছেন যে আগামী দু'বছরের মধ্যে এই নীতির ভিত্তিতে তৈরি এয়ারকন্ডিশনার বাজারে আসবে এবং এর পর ফ্রিজ আসতে দেরি হবে না।





বাড়িতে রসায়ন

রাসায়নিক দ্রব্যের কথা উঠলেই আমরা মনে করি একটি ল্যাবরেটরির কথা অথবা শিল্প কারখানার কথা। অথচ আমাদের বাড়িতে রান্নাঘরে, গোসলখানায় অথবা এমনি অন্য জায়গায় যেসব দ্রব্য আমরা নিত্য ব্যবহার করছি তাদেরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পরিচয় রয়েছে। অনেক সময় আমরা বাইরের রসায়ন সম্বন্ধে বেশ কিছু জেনেও বাড়ির রসায়নকে সেভাবে চিনতে পারি না। আজ তাই এমনি কিছু সাধারণ জিনিসের খবর নেওয়া যাক।

রসায়নের কথা বলতে এসিডের কথাটি আগে মনে আসে। এমনি একটি এসিড আমাদের রান্নাঘরে প্রায়ই মজুদ থাকে, সেটি সিরকা বা ভিনেগার—এসেটিক এসিড। অবশ্য মারাত্মক সবকিছু ক্ষয়কারী যে সব এসিড রয়েছে এটি সে রকম খনিজভিত্তিক এসিড নয় সালফিউরিক বা নাইট্রিক এসিডের মত। এটি নেহাৎ গোবেচারা পাতলা জৈব এসিড। তবে এসিডের সব রকম গুণ এর মধ্যেও বর্তমান—তাইতো এর সাহায্য চমৎকার জারানো যায় পেঁয়াজকে কিংবা অন্যান্য নানা সব্জি বা ফলকে। এমনি দুর্বল এবং নিরাপদ আরো কিছু জৈব এসিডের পরিচয় আমরা বাড়িতে বসেই পেতে পারি। লেবু আর কমলার রসে রয়েছে সাইট্রিক এসিড। কাঁচা আপেলে আছে ম্যালিক এসিড, আর আঙুরের রসে টারটারিক এসিড। এগুলোর সবই যে সত্যি এসিড তা মুখের টক অনুভূতিতেই বোঝা যায়, তা ছাড়া নীল লিটমাস কাগজকে এরা ঠিক লাল রঙে পরিবর্তিত করবে।

বাড়ির সবচেয়ে জরুরি রাসায়নিক দ্রব্যের কথাটি এখনো বলা হয়নি, সেটি লবণ। রসায়নের ভাষায় অবশ্য লবণ বলতে অনেক কিছুকেই বোঝায়—এসিড আর ক্ষারের বিক্রিয়ায় যা সৃষ্টি হয়। আমাদের রান্নাঘরের সাধারণ লবণটি একটি সোডিয়াম যৌগ—

সোডিয়াম ক্লোরাইড। প্রকৃতিতে এটা প্রচুর রয়েছে। আমাদের দেশের সবটুকু লবণই আমরা পাই উপকূল অঞ্চলে জমিতে সমুদ্রের পানি ঢুকিয়ে এবং ধীরে ধীরে সৌর তাপে সে পানিকে উড়িয়ে দিয়ে। নোনা পানির লবণটুকু তখন নিচে পড়ে থাকে। দুনিয়ার সর্বত্র ভিনেগার আর লবণের ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল থেকে দেখা যায় প্রধানত এদের খাদ্য সংরক্ষণকারী এবং খাদ্যের স্বাদ সৃষ্টিকারী ভূমিকার জন্য।

লবণ ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি সোডিয়াম যৌগ আমাদের বাড়ির রসায়নের অঙ্গীভূত। ধোয়ার সোডা বলে পরিচিত যে গুড়া ধোয়া-মোছায় ব্যবহৃত হয় সেটি সোডিয়াম কার্বনেট। এটা খর পানিকে কোমল করে, তৈজসপত্রের উপর পানি থেকে বিশ্রী গাদ জমতে দেয় না। এর সোডিয়াম আয়নের সাথে খর পানির ধাতব আয়নের স্থান পরিবর্তন হয় বলেই এটা খরতা নিরসন করতে পারে। তেমনি আবার রয়েছে খাবার সোডা বা বেকিং সোডা। এটি সোডিয়াম-বাই-কার্বনেট। কেক ও রুটি বানাতে রান্নাঘরে এটি আমরা ব্যবহার করছি। কেক বা রুটির খমীরার সাথে এটি যখন উত্তপ্ত হয় তখন এর যৌগ ভেঙে গিয়ে কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস বেরিয়ে আসে। এই গ্যাস বুদবুদের মত আটকে পড়ে রুটিকে ফুলিয়ে তোলে। বাড়িতে কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাসের সাক্ষাৎ আমরা পানীয়ের মধ্যেও পাই—কোকা কোলা, ফান্টা ইত্যাদি সফট ড্রিংকের মধ্যে।

সোডিয়াম যৌগের আরো একটি উদাহরণ আমরা বাড়িতে রোজ ব্যবহার করছি, এটি সাবান। সাধারণত সাবান হচ্ছে সোডিয়াম স্টিয়েরেট। চর্বিকে কস্টিক সোডা অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে সিদ্ধ করলে সাবান পাওয়া যায়। চর্বি হচ্ছে গ্লিসেরাইল স্টিয়েরেট। এই বিক্রিয়ায় এটা ভেঙে গিয়ে গ্লিসারিন আর সোডিয়াম স্টিয়েরেট অর্থাৎ সাবান গঠন করে। গ্লিসারিন নিজেও প্রায়ই আমাদের বাড়িতে স্থান পায়, শুষ্ক আবহাওয়ায় হাত মুখ ফেটে গেলে লাগাবার জন্য। সাবানের থাকে হাইড্রোকার্বন চেইনের লম্বা অণু। এর এক প্রান্ত পানিতে দ্রবণীয়, অন্য প্রান্ত তৈলাক্ত পদার্থে। ময়লা সাধারণত তেল-গ্রিজ জাতীয় পদার্থের মাধ্যমে আটকে থাকে। এ কারণেই ময়লাকে আলগা করে নিয়ে সাবান পরিষ্কার করার কাজ করতে পারে। আজকাল অনেক বাড়িতে কাপড় ধোয়ার জন্য অন্য জিনিসও থাকে যা সাবান নয়। এটি ডিটারজেন্ট। এর গঠন বিক্রিয়া অন্য রকম এবং আরো জটিল, তবে কার্য পদ্ধতির নীতি একই।

এ পর্যন্ত উল্লেখিত অধিকাংশ রাসায়নিক দ্রব্য কিন্তু বহুদিন ধরেই মানুষ দৈনন্দিন ব্যবহার করছে। এগুলো আবিষ্কৃতও হয়েছে মোটামুটি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে; কাজে লাগতে দেখা গেছে বলেই ধীরে ধীরে এরা ব্যবহারের অঙ্গীভূত হয়েছে। কিন্তু আধুনিক আরো অনেক রাসায়নিক দ্রব্য আমাদের ঘরে স্থান পাচ্ছে যেগুলো ঠিক সেভাবে আসেনি। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে রাসায়নিক গবেষণার মাধ্যমেই এরা আবিষ্কৃত হয়েছে—প্রধানত গবেষণাগারে। উদাহরণস্বরূপ, সাবান সুপ্রাচীন জিনিস, এর আবিষ্কারককে চিহ্নিত করা যায় না। কিন্তু ডিটারজেন্ট আধুনিক গবেষণার ফসল। সঙ্গত কারণেই এভাবে আবিষ্কৃত জিনিসগুলো রাসায়নিকভাবে জটিলতর।

ঘরের রাসায়নিক দ্রব্যগুলোর কোন কোনটির কাজ ধ্বংসাত্মক—বিব্রতকর পোকা মাকড় এবং জীবাণুর বিরুদ্ধে এদের প্রয়োগ। আলমারী বা ট্রাংকে রাখা জামা কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে আমরা ব্যবহার করি কর্পূর বা ন্যাপথেলিন। এটি আলকাতরা তৈরির সময় একটি উপজাত হিসেবে পাওয়া যায়। এর একটি ব্যতিক্রমী আচরণ হল কঠিন অবস্থা থেকেই সরাসরি বায়বীয় অবস্থায় চলে যাওয়া—এ জন্যই তো কর্পূরের মত উবে যাওয়ার কথা বলা হয়। কর্পূর পোকা মাকড়কে দূরে রাখে। তেলাপোকা বা মশা মাছির বিরুদ্ধে যে সব সস্তা ওষুধ আমরা বাড়িতে রাখি তার অধিকাংশই ডিডিটি দিয়ে তৈরি। এর পুরো নাম ডাই ক্লোরো ডাই ফিনাইল-ট্রাইক্লোরো ইথেন। ডিডিটি একটি দক্ষ কীটনাশক, কিন্তু সাম্প্রতিক কালে মানুষের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাবের কথা বিবেচনা করে এর ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। কাজেই ডিডিটি ঘটিত কীটনাশক বাড়িতে রাখার ব্যাপারে আমাদের সাবধান হওয়া উচিৎ। আজকাল অবশ্য ঘরে ব্যবহারের জন্য অন্যান্য নানা নিরাপদ কীটনাশক পাওয়া যায়, তবে সেগুলোর দাম অপেক্ষাকৃত বেশি।

কীটনাশকের মত বিরক্তিকর জিনিসের প্রসঙ্গ থেকে এবার আমরা বাড়ির এমন কিছু রসায়নের কথায় আসি যেগুলো আমাদের সবার প্রিয়—এরা প্রসাধন সামগ্রী। এদের উন্নয়নও অনেকখানি রসায়নের কৌশলের উপর নির্ভর করে। সুগন্ধ দ্রব্য তৈরির মূল যে উপাদান সেগুলার অণু অত্যন্ত জটিল। তাই এগুলোকে প্রায়শ প্রকৃতি থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত ফুল ও বিশেষ গাছের অন্য কিছু অংশ থেকে পাতনের মাধ্যমে এই উপাদান নিষ্কাশন করা হয়। এমনিভাবে প্রচুর পরিমাণে গোলাপের পাপড়ি অথবা ল্যাভেন্ডার ফুলের পাতনের ফলশ্রুতিতে আসে অতি সামান্য পরিমাণ সুগন্ধি উপাদান। এ জন্যই সুগন্ধি দ্রব্যের এত দাম।

সাধারণ সাবান যে সোডিয়াম স্টিয়েরেট সেটি আমরা দেখেছি। কিন্তু তৈরির সময় সোডিয়াম যৌগের বদলে পটাশিয়াম যৌগ ব্যবহার করে, অথবা ভিন্ন ধরনের চর্বি ব্যবহার করে শক্ত সাবানের বদলে নরম, জেলীর মত, তরল ইত্যাদি নানা রকম সাবান তৈরি করা সম্ভব। প্রসাধনী দ্রব্যে এরকম নানা সাবানের ব্যবহার আমরা দেখি। তরলের বদলে কঠিন সুগন্ধি তৈরিতে সাবান ব্যবহার করা হয়। শ্যাম্পুর জন্য ব্যবহার করা হয় জেলীর মত বা টলটলে সাবান। মুখে মাখার জন্য যে ফেইস ক্রিম ব্যবহৃত হয় তা আসলে বিশেষ ধরনের নরম সাবানের সাথে চর্বি বা তেল জাতীয় পদার্থের ঘুঁটে নেয়া মিশ্রণ।

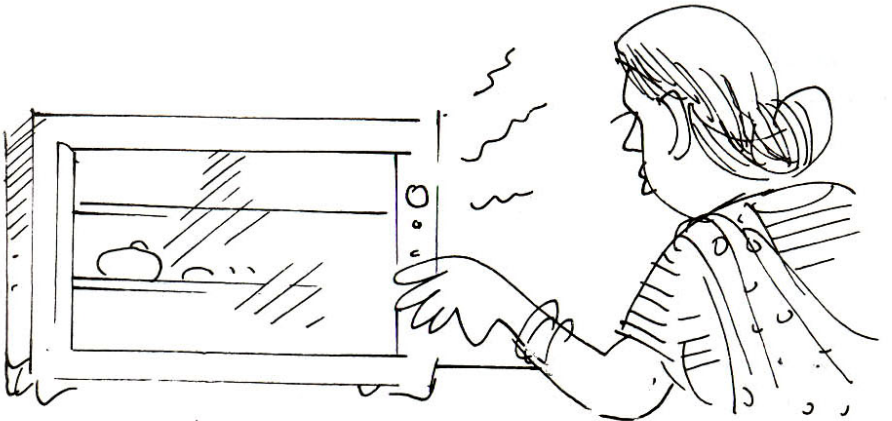
লিপস্টিকও জৈব রসায়নের একটি অবদান। এতে তেল ও চর্বি জাতীয় জিনিসের সাথে মেশানো থাকে রঞ্জক বস্তু। তেলের অংশটুকু ঠোঁটের সাথে রঞ্জক বস্তু সংযুক্ত করে আর চর্বির অংশটুকু তার উপর একটি পাতলা আবরণের সৃষ্টি করে। মাখনের মত লিপস্টিকেরও ঠাণ্ডায় জমে কঠিন হওয়ার আর গরমে গলতে চাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। ট্যালকম পাউডার হল জিংক অক্সাইড, ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট আর হেক্সাক্লোরোফিনের মিশ্রণ।

জৈব রসায়নের একটি প্রধান দ্রাবক এসিটোন আমাদের বাড়িতে আসে নখ পালিশের অংশ হিসেবে এবং নখ-পালিশ মোছার তরল হিসেবে। এসিটোন সাধারণত পেট্রোলিয়াম থেকেই তৈরি হয় এবং দ্রাবক হিসেবে এর চমৎকার উপযোগিতা। এ ছাড়া এটি খুব দ্রুত উঠে যায় বলে পালিশের রং নখের উপর চট করে শুকিয়ে বসে যেতে পারে। এতে এসিটোনের বদলে অন্যান্য কেটোন জাতীয় তরলও ব্যবহৃত হতে পারে। নখ পালিশের বিশেষ গন্ধ এদের উপস্থিতি সূচিত করে। ঘরে নখ পালিশ তোলার তরল থাকলে তা দ্রাবক হিসেবেও অন্যান্য অনেক রকম দাগ মুছতে ব্যবহৃত হতে পারে।

আজকাল কি সুগন্ধি দ্রব্য, কি কীটনাশক এদের প্রয়োগবিধিতেও কিছু উন্নয়ন ঘটেছে। এগুলো এখন বাড়িতে আসছে স্প্রে করে এরোসল হিসেবে ছিটাবার উপযোগী হয়ে। বদ্ধ টিনের মধ্যে জিনিসটি রাখা হয় গতিদানকারী অন্য একটি তরলের সাথে মিশিয়ে যথেষ্ট চাপের মধ্যে। বোতাম টিপে চাপটা তুলে নিলে ঐ তরলটি দ্রুত তরল থেকে বাষ্পে পরিণত হয় এবং সুগন্ধি বা কীটনাশককে সাথে নিয়ে বেরিয়ে সূক্ষ্ম আকারে ছড়িয়ে দেয়। ঐ গতিদানকারী তরলটি সাধারণত হয় ক্লোরো ডাই ফ্লোরো মিথেন—এটা চাপে সহজে তরল হয়, আর চাপ তুলে নিলে সহজে গ্যাস হয়ে পড়ে।

রসায়ন বা রাসায়নিক দ্রব্যের খোঁজ পড়লে আমাদের কি সব সময় ল্যাবরেটরিতে দৌড়াতে হবে? মোটেই না। রসায়ন রয়েছে আমাদের রান্নাঘরে, গোসলখানায়, কিংবা ড্রেসিং টেবিলে—দৈনন্দিন কাজের সাথে একাকার হয়ে।





মাইক্রোওয়েভ চুলা : এখন রসায়নের রান্নায়

মাইক্রোওয়েভ চুলার সঙ্গে আমাদের পরিচয় রান্নাঘরে। সুবিধা এর অনেক। ধাতব পাত্র তেমন কিছু লাগে না—একটা কিছুর উপর রেখে ঢুকিয়ে দিলেই চলে। ধাতব পাত্র না হলে পাত্রটি গরমই হবে না—হবে শুধু খাবারটাই গরম; আর তাই তো চাই। খাবারটাও বাইরের গা গরমে পুড়ে কালো আর ভেতরটা এখনো ঠাণ্ডা এমনটি হবার কোন সম্ভাবনা নেই। পুরোটা এক সঙ্গে একই রকমের হবে। পুরো ব্যাপারটিতে সময়ও লাগবে তুলনামূলকভাবে কম।

এখন মাইক্রোওয়েভ চুলার গুণাগুণ রাঁধুনীর কাছে শুনেই আমরা সন্তুষ্ট নই। এর গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ হয়েছেন রসায়নবিদরাও। তাঁরা এখন রসায়নের গবেষণাগার থেকে বুনসেন বার্নারকে, হটপ্লেটকে বিদায় করে মাইক্রোওয়েভকে ব্যবহার করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কারণ অবশ্যই আছে, এবং তা রান্নার বেলায় অনেক সুদূরপ্রসারী।

আরো দ্রুত, আরো দক্ষ

রসায়নবিদরা মাইক্রোওয়েভের সাহায্যে যখন তাঁদের মিশ্রণকে উত্তপ্ত করাতে বিক্রিয়া ঘটছে অনেক দ্রুত,অনেক সম্পূর্ণরূপে। এখানেও তেমন কোন পাত্রের জটিলতা দরকার হচ্ছে না, শুধু উত্তপ্ত করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে না কোন দ্রবণের। দ্রবণ না লাগা মানে অনেক ক্ষেত্রেই দাহ্য, বিপদজনক, কিন্তু দূষণকারী কেমিক্যাল্‌স থেকে মুক্তি। শুধু তাই নয় সাধারণ পদ্ধতিতে বিক্রিয়ায় অনেক সময় সরাসরি কাঙ্খিত ফলাফলে চলে না গিয়ে কিছু বাড়তি বিক্রিয়ায় যে অবাঞ্চিত কেমিক্যালসের সৃষ্টি হতে পারে, তাও মাইক্রোওয়েভের ক্ষেত্রে কমানো যায়। আধুনিক ওষুধ তৈরি, হাই-টিসি সুপার কন্ডাক্টর তৈরির মত গুরুত্বপূর্ণ ফলিত কাজেও মাইক্রোওয়েভ নতুন দিগন্ত এনে দিচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই নতুন ঘটনাগুলো ঘটছে কেন? এটি কি শুধু দক্ষতর উত্তাপের কারণেই, নাকি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মাইক্রোওয়েভের নিজস্ব কোন বাড়তি অবদান রয়েছে? বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞানীরা ভাবছেন ১৯৮৮ সাল থেকে। সে বছর লক্ষ্য করা হয় যে, কোন কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া মাইক্রোওয়েভের সাহায্যে ঘটালে তা হাজার গুণেরও বেশি দ্রুততর হয়ে পড়ে। একি শুধু অধিক হারে উত্তপ্ত করার জন্যই হয়ে যেতে পারে?

নিজস্ব বিশেষ অবদানের তত্ত্বটি অবশ্য পরবর্তী সময়ে তেমন সমর্থিত হয়নি বরং দেখা গেছে যে মাইক্রোওয়েভের ফলে দ্রবণগুলো সাধারণ স্ফুটনাঙ্কে উত্তপ্ত হওয়া বন্ধ না হয়ে সুপার-হীটেড অবস্থায় পৌঁছে আরো উপরের তাপমাত্রায় চলে যেতে পারে। কোন কোন দ্রবণের ক্ষেত্রে এটি স্বাভাবিক স্ফুটনাঙ্ক ৩৮° সে. এর উপরেও চলে যেতে পারে। কাজেই রাসায়নিক গবেষণাগারে মাইক্রোওয়েভের কলাকৌশলের মধ্যে দ্রুত অধিক উত্তাপ সৃষ্টিটিই মুখ্য তাতে সন্দেহ নেই।

মাইক্রোওয়েভ কিভাবে উত্তপ্ত করে?

মাইক্রোওয়েভ আসলে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তী বিদ্যুৎ ক্ষেত্র। কঠিন ও তরল পদার্থের উপর যখন এই ক্ষেত্র আপতিত হয়—তখন তাতে উত্তাপ হয়—তাও বৈদ্যুতিক কারণেই ঘটে। এই কারণটি ক্ষেত্র বিশেষ দু'রকমের হতে পারে।

প্রথমটি হল বিদ্যুৎ পরিবাহিতা। ধাতু এবং অন্যান্য যে সব বস্তুর মধ্য দিয়ে কমবেশি বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয় বিদ্যুৎ প্রবাহের সময় সেগুলো উত্তপ্ত হয়। মাইক্রোওয়েভ এগুলোর উপর আপতিত হলে সেখানকার ইলেকট্রনিক আর আয়নগুলো অতি উচ্চ ভোল্টেজ অনুভব করে যার ফলে স্থানীয় বিদ্যুৎ প্রবাহ ও উত্তাপের সৃষ্টি হয়। ভোল্টেজ অনেক বেশি হয়ে দাঁড়ালে সেখান থেকে ছোট বিজলীর মত স্ফুলিঙ্গ বের হওয়াও বিচিত্র নয়। মাইক্রোওয়েভ চুলায় ধাতব চামচ, কাঁটা চামচ ইত্যাদি দিয়ে দেয়া হলে এমনি স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

উত্তাপের দ্বিতীয় কারণটি হল ডাইপোলার পোলারাইজেশন। কোন কোন পদার্থের অণুর মধ্যে বৈদ্যুতিক ডাইপোল থাকে—অর্থাৎ তার একটি ধনাত্মক প্রান্ত থাকে আর আরেকটি ঋণাত্মক প্রান্ত থাকে। পানির অণু এমনি একটি ডাইপোল। মাইক্রোওয়েভ এসে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করলে ডাইপোলটি এর প্রভাবে একদিকে ঘুরে যায়। কিন্তু পরক্ষণে ক্ষেত্রের দিক বদল হলে ডাইপোলটিও আবার সেদিকে ঘুরে যাবার চেষ্টা করে। এভাবে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে তাল মিলাতে গিয়ে যে মোচড় খাওয়া নাচনের মধ্যে অণুগুলো পড়ে তার ফলে এরা উত্তেজিত ও উত্তপ্ত হয়ে পুরো খাবারটিকে গরম করে ফেলে।

মাইক্রোওয়েভের সৃষ্ট উত্তাপ সাধারণ চুলার মত জিনিসটার একদিকে শুরু করে তাপের পরিবহন-পরিচলনে অন্য দিকে পৌঁছায় না। প্রত্যেক অণুকে এটি সরাসরি

একই সঙ্গে উত্তপ্ত করে। ফলে স্ফুটনাঙ্কে যাবার আগে এটি সুপারহীটেড হয়ে পড়তে পারে।

বিক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ

মাইক্রোওয়েভের ক্ষেত্রে রসায়নবিদরা আরো বেশি সুবিধা যে জিনিসটা মনে করেন তা হল বিক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। এটি শুধু বিক্রিয়ার গতির ব্যাপার নয় বিক্রিয়ার ফলে যা পাওয়া যাবে সেটিও কিছুটা পছন্দ করে নেবার সুযোগ তাঁরা এতে পেয়ে যান। উদাহরণস্বরূপ ন্যাপথলিনের সঙ্গে সালফিউরিক এসিড যোগ করার বিক্রিয়াটির কথা ধরা যাক। সালফোনিক গ্রুপটি দুটি পজিশনে সংযোজিত হতে পারে—দু'রকম অণু দিয়ে। মাইক্রোওয়েভের ক্ষমতা (পাওয়ার) কম রাখলে যা পাওয়া যায় তাতে দুরকমই সমান সমান সংখ্যক পাওয়া যায়। ক্ষমতা বেশি রাখলে বিক্রিয়া দ্রুততর হয় এবং প্রায় শতকরা একশ' ভাগই দ্বিতীয় প্রকারের অণু পাওয়া যায়। মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার না করলে এভাবে নিয়ন্ত্রণের সুযোগ থাকে না।

ধাতুর সঙ্গে সালফার, সেলেনিয়াম, টেলুরিয়াম মিশিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক গোষ্ঠী মেটাল-ক্যালকোজেনাইড গঠন করা হয়। সেমিকন্ট্রাক্ডর রূপে, ব্যাটারি ইলেকট্রোলাইটরূপে এগুলোর আধুনিক ব্যবহার রয়েছে। অথচ সনাতন উপায়ে এদের তৈরি করতে অনেক দীর্ঘ সময় লেগে যায়। সীলকরা কাঁচের টিউবের মধ্যে ধাতু ও সালফারের গুড়ার মিশ্রণকে উত্তপ্ত করে মেটাল সালফাইড তৈরি করা হয়। কিন্তু কিছু উত্তাপেই সালফার বাষ্প হয়ে যায়। অতি দ্রুত এটি ঘটে বাষ্পের চাপে টিউব বিস্ফোরিত হয়ে গুড়িয়ে যায়। তাই পুরো ব্যাপারটি করতে হয় অতি ধীরে, এত ধীরে যে বিক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে সপ্তাহেরও অধিক সময় লেগে যেতে পারে।

কিন্তু মাইক্রোওয়েভ দিয়ে গরম করলে বিস্ফোরণের কোন ভয় ছাড়াই উত্তপ্ত করে বিক্রিয়া ১৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করে ফেলা যায়। এর কারণ সোজা। মাইক্রোওয়েভ সালফারকে উত্তপ্ত না করে করছে ধাতুকে—কাজেই সালফারের দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে চাপ দেবার কোন সম্ভাবনা নেই।

একই নীতি কপার-ইনডিয়াম ডাই সেলেনাইডের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যৌগের মাধ্যমে অতি আধুনিক ও দক্ষ নতুন ধরনের সৌরকোষ অপেক্ষাকৃত সুলভে তৈরির সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

মাইক্রোওয়েভের নিজের ভূমিকা

উত্তাপের পথে ছাড়াও বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে মাইক্রোওয়েভের সরাসরি অবদানের বিষয়টি এখনো অনেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন। সিরামিকের ক্ষেত্রে এর কিছু প্রমাণও মিলেছে সম্প্রতি। সিরামিক হল পরমাণু অথবা আয়োনের বিশালাকার সমাবেশ। সাধারণত

বিভিন্ন উপাদানের সূক্ষ্ম কণার মিশ্রণকে উচ্চ উত্তাপে উত্তপ্ত করে এটি তৈরি হয়। জড়াজড়ি করে থাকা কণাগুলো এর ফলে পরস্পরের সঙ্গে গলে সংযুক্ত হয়ে পরমাণু বা আয়োন বিনিময়ের মাধ্যমে সিরামিক গঠন করে। পদ্ধতিটিকে বলা হয় সিনটারিং।

বিজ্ঞানীরা সাধারণ পদ্ধতিতে এবং মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে সিনটারিং ঘটিয়ে উভয়ের তুলনা করেছেন। যতই কণাগুলো পরস্পর সংযুক্ত হয় তখন সবকিছু সংকুচিত হয়ে পড়ে। দেখা গেছে উভয় পদ্ধতিতে একই উত্তাপে গরম করা সত্ত্বেও সংকোচন মাইক্রোওয়েভের ক্ষেত্রে অনেক দ্রুত হচ্ছে। এতে কেউ কেউ মনে করছেন মাইক্রোওয়েভের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে পরমাণু বিনিময়ে সরাসরি অবদান রেখে ব্যাপারটি ঘটছে। কারণ যাই হোক অধিক পরিমাণ সিরামিক তৈরির জন্য মাইক্রোওয়েভ ফারনেস তৈরি করে শক্তির ব্যয় ৬০ শতাংশ আর সময় ৭০ শতাংশ বাঁচিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে। সিরামিকের এই ব্যাপারটিকে এখন কাজে লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে হাই-টিসি সুপার কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে। কারণ গত এক দশকের মত সময়ের মধ্যে নব আবিষ্কৃত এই পদার্থগুলোর উপর কাজ চলছে অত্যন্ত দ্রুত হারে আর সম্ভাবনার নব দিগন্ত এনে দিচ্ছে। হাই-টিসি সুপার কন্ডাক্টরের উদ্ভাবনের ফলে অতিপরিবাহী বস্তু এখন আর অত্যন্ত নিম্ন উত্তাপের বিরল পরিবেশের কোন ব্যাপার নয়, সাধারণ যে-কোন ল্যাবোরেটরিতে সাধারণ নিম্ন উত্তাপেই এগুলো সৃষ্টি করা যাচ্ছে। অর্থাৎ এর বাস্তব ব্যবহারের যে স্বপ্ন মানুষ গত আশি বছর ধরে দেখেছে এখন তার বাস্তবায়ন হাতের মুঠোয়। আর এই নতুন সুপার কন্ডাক্টরগুলো সিরামিক প্রকৃতির। এ জন্য ফোকাস করা মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে উচ্চ চাপ রাখা বস্তুকে হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াসে উত্তপ্ত করার আয়োজন চলছে। যেহেতু আগামী দিনগুলোতে অনেক ক্ষেত্রে সিরামিকের জয়জয়কার হবে, বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

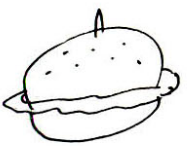
পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক

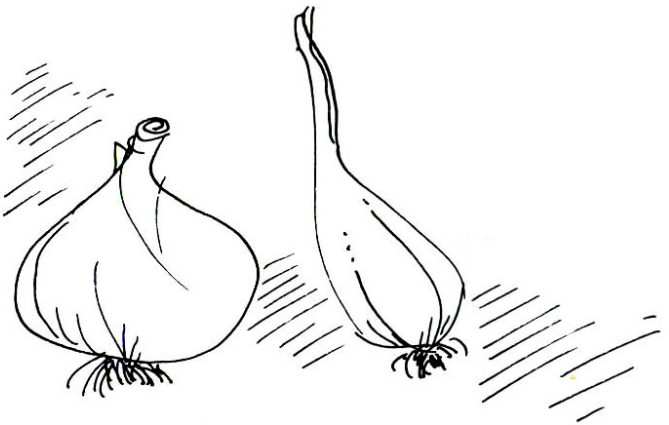
মাইক্রোওয়েভ রসায়নের দূষণের দুর্নাম ঘুচাতেও এগিয়ে এসেছে। যেসব নানারকম দ্রবণের ঝকমারি নেই দূষণের উৎসও এতে কমে যাচ্ছে। রসায়ন শিল্পে দূষণের একটি বড় কারণই হল দ্রবণের ব্যবহার। বিক্রিয়ার পর পরিত্যক্ত দ্রবণ কোথায় নেয়া হবে এ এক বড় সমস্যা। পরিবেশের ক্ষতি না করে এর বিহিত করা ব্যয়সাধ্য। তাই সবার চেষ্টা কম দূষণকারী দ্রবণ ব্যবহার করা। তবে সবচেয়ে ভাল দ্রবণ হল কোন দ্রবণ না থাকা—এটি সম্ভব করে মাইক্রোওয়েভ। স্পঞ্জের মতো স্বচ্ছিদ্র কোন ধারক বস্তুর উপাদানগুলোকে সম্পৃক্ত করে নিয়ে এই স্পঞ্জ ও উপাদান এক সঙ্গে মাইক্রোওয়েভে উত্তপ্ত করা যায়। স্পঞ্জের বহু বিস্তৃত তলদেশে উপাদানের অণুগুলো সহজেই কাছাকাছি গিয়ে বিক্রিয়া করতে পারে। কোন দূষণ আর বিলম্ব ছাড়াই পুরো ঘটনা ঘটাতে পারে।

শুধু বর্তমান বা ভবিষ্যতের দূষণ থেকে মুক্ত করেই নয়, অতীতে যে দূষণের অপরাধ রসায়ন শিল্প ইতিমধ্যে করে ফেলেছে কোন কোন ক্ষেত্রে তা দূর করতেও

মাইক্রোওয়েভ সহায়ক হচ্ছে। কারণ পুরানো ফ্যাক্টরির মাটিতে বিষময় রাসায়নিক বর্জ্যের আধিক্য যেখানে দেখা দিয়েছে মাটিকে সেটি থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা এভাবে হচ্ছে। বিশেষ ধরনের ক্যাটালিস্ট মিশিয়ে মাইক্রোওয়েভ দিয়ে বিকীর্ণকরণে বিষময় পদার্থগুলো ভেঙে দিয়ে নির্দোষ পদার্থে পরিণত হচ্ছে। ছোট পলিমারে এটি করে সুফল পাওয়ার পর এখন শিল্প এলাকায় ব্যাপক দূষণমুক্তকরণে এর ভিত্তিতে পরিকল্পনা করা সম্ভব হচ্ছে।

মাইক্রোওয়েভ যে ইতিমধ্যে রান্নাঘরের গণ্ডি পার হয়ে অনেক দূর চলে গেছে সেটি আমরা অনেকেই টের পাইনি। বিজ্ঞানীদের মধ্যেও এখনো এর ব্যাপক ব্যবহারের মনোভঙ্গি গড়ে ওঠেনি। রসায়নের নানা দিক থেকে নেয়া চমকপ্রদ এ ধরনের উদাহরণগুলো শিগগির মনোভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন আনবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।





পেঁয়াজ রসুনের বিজ্ঞান

বলা হয় দুনিয়াটা দুই রকমের গোষ্ঠীতে বিভক্ত—এক. যারা পেঁয়াজ রসুন পছন্দ করে, দুই. যারা এদেরকে ভীষণভাবে অপছন্দ করে। আমরা বাঙালিরা যে প্রথম দলে পড়ি তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। পেঁয়াজ-রসুন চিরকাল আমাদের সপ্ত-ব্যঞ্জনের অন্যতম অংশ ছিল। আমাদের এই দলে কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে বিখ্যাত অনেক জনগোষ্ঠীকে ফেলা যায়। মিশরের ফেরাউনদের যখন মমি করে পরকালের আরাম-আয়েসের জন্য অনেক সম্পত্তি ও সামগ্রী দিয়ে সমাধিস্থ করা হতো, তখন পেঁয়াজ আর রসুনের কাদা ও কাঠের তৈরি প্রতিকৃতি দিয়ে দিতেও ভুল হতো না। পরকালের খাবারগুলোতে পেঁয়াজ রসুনের স্বাদ থাকবে না সে কি কখনো হয়? আদি ইহুদীরা মিশর থেকে বিতাড়িত হয়ে যখন সিনাইয়ের মরুভূমিতে ৪০ বছর ধরে নিরুদ্দেশ বাস করছিল তখন তাদের হা-হুতাশ ছিল "মিশরের মাছ, তরমুজ, কুমড়া, ডাঁটা আর পেঁয়াজ রসুনের" জন্য।

পেঁয়াজ রসুন বিরোধীরাও অবশ্য কখনো বিশেষ দূরে ছিল না। সেই প্রাচীন মিশরেও পুরোহিত শ্রেণীরা একে পরিহার করে চলতো অতি সযত্নে। গ্রীক লেখক প্লুটার্ক তাদের সম্বন্ধে লিখেছেন 'তারা মনে করতো পেঁয়াজ-রসুন উপবাসেরও উপযুক্ত নয়, ভোজ-উৎসবের উপযুক্তও নয়। কারণ এক দিকে এটা তৃষ্ণা বাড়ায় আবার অন্যদিকে চোখের পানির উদ্রেক করে।" প্রাচীন গ্রীকরাও এর বিরোধী ছিল, তারা এর গন্ধকে স্থূল রুচির পরিচায়ক মনে করতো। একই কারণে শেক্সপীয়ারের 'এ মিডসামার নাইট্স ড্রিমে' বটম তার নাটকের দলকে উপদেশ দিচ্ছে, "কদাচ পেঁয়াজ খেয়ো না, রসুনও নয়; আমাদের উচ্চারণে যেন মিষ্টি শ্বাস বয়।"

রসায়নবিদরা পেঁয়াজ রসুনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন বহুকাল ধরে তবে সেটি পেশাগত কারণে। এদের ঝাঁঝালো গন্ধ, তীব্র স্বাদ আর স্পষ্ট শারীরবৃত্তীয় প্রভাব

রাসায়নিক বিশ্লেষণকে উৎসাহিত করেছে। গত এক শতাব্দীর গবেষণার কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। পেঁয়াজ আর রসুন কাটলে তার থেকে নিম্ন আণবিক ওজনসম্পন্ন কিছু অর্গানিক অণু নিঃসৃত হয়। এদের মধ্যে সালফার পরমাণু একটি বিশেষ বন্ধনের অবস্থায় থাকে যা সচরাচর অন্যত্র দেখা যায় না। এই অণুগুলো খুবই সক্রিয় প্রকৃতির এবং এদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রভাব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পেঁয়াজের অশ্রু-উদ্রেককারী প্রভাবের কথা বলা যায়। পেঁয়াজ আর রসুন থেকে প্রাপ্ত কোন কোন নির্যাস জীবাণু ও ছত্রাকনাশক হিসেবে কাজ করে। আবার অন্য কিছু নির্যাস রক্তকে জমাট বাঁধতে বাধা দেয়।

পেঁয়াজ আর রসুনে উদ্ভিদতত্ত্বের দিক থেকে একই লিলি পরিবারের দুই ভিন্ন সদস্য—পেঁয়াজের নাম এলিয়াম সেটিভাম আর রসুনের এলিয়াম সেপা। প্রাচীন কাল থেকেই এরা নানা রকম লোকজ ওষুধের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ১৫৫০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে লিখিত একটি মিশরীয় প্যাপিরাসের ভাষ্য অনুযায়ী ২২টি বিভিন্ন অসুখে রসুনের উপশমকারী ভূমিকা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে হার্টের রোগ, মাথাধরা, বিষাক্ত কামড়, কৃমি এবং টিউমার। গ্রীসে এরিস্টোটল, হিপোক্রেটেস এবং এরিস্টোফানেসের মত পণ্ডিত ব্যক্তিরা রসুনের ওষুধ-গুণের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রাচীন ভারতে ক্ষতস্থান ধোবার জন্য জীবাণুনাশক লোশন তৈরিতে রসুন ব্যবহার করা হতো। চীনে জ্বর, মাথাধরা, কলেরা আর দাস্তের জন্য পেঁয়াজ দেয়া চা বহুকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

লোকজ ওষুধের সূত্র ধরে আধুনিকতর গবেষণাগুলো পেঁয়াজ আর রসুনকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছে। ১৮৫৮ সালে লুই পাস্তুর জানিয়েছেন যে, রসুনের জীবাণুনাশক গুণ রয়েছে। দুই মহাযুদ্ধের সময়ও রসুনকে ক্ষত স্থানের পচন এড়াবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে রসুনের রসকে অনেকখানি পাতলা করে নিলে তা স্টেফাইলোক্কাস, স্ট্রেপটোক ককাস, ভিব্রিও (কলেরার জীবাণুসহ) ব্যাসিলাস (টাইফয়েড, আমাশা, অন্ত্র পীড়ার জীবাণুসহ) গোষ্ঠীর জীবাণুর বৃদ্ধিরোধ করে। তা ছাড়া ক্ষতিকর ছত্রাক ও ঈস্টের বিরুদ্ধে এটা বেশ সক্রিয়।

১৯৭৯ সালে ভারতের এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, পেঁয়াজ-রসুন কম খায় এমন মানুষের রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত বেশি। রক্ত নালী ও হার্টের অসুখের জন্য এদের যে লোকজ ব্যবহার এর একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সাম্প্রতিক আরো কিছু গবেষণার মাধ্যমে স্থাপিত হয়েছে।

পেঁয়াজ আর রসুনের সালফার গঠিত যৌগগুলোর মধ্যেই এর বিভিন্ন গুণাগুণ নিহিত রয়েছে। সালফার যৌগগুলো বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নিষ্কাশন করা হয়। পানিতে রসুনকে সিদ্ধ করে তার বাষ্পের তরলিত রূপ থেকে (পাতন পদ্ধতি) পাওয়া যায় ডাই এলাইন ডাই সালফাইড। সাধারণ উত্তাপে ইথাইল এলকোহলে দ্রবীভূত করে পাওয়া যায় এলিসিন যা রসুনের গন্ধের জন্য দায়ী। বরফের চেয়েও নিম্ন উত্তাপে ইথাইল এলকোহল ব্যবহার করে পাওয়া যায় এলিন। পেঁয়াজের ক্ষেত্রে বাষ্পীয় পাতনে পাওয়া যায় প্রপাইনো এলডিহাইড ও ডাইপ্রপাইল ডাই সালফাইড। ফ্রেয়ন ও পানির মিশ্রণকে

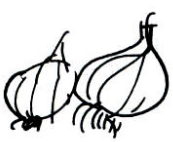
দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করে পাওয়া যায় অশ্রু উদ্রেককারী অংশ। নিম্ন উত্তাপে ইথাইল এলকোহলের সাহায্যে পাওয়া যায় একই গুণের সূত্রপাতকারী অংশটুকু।

সত্তরের দশকে রসুনের মধ্য থেকে পাওয়া একটি নির্যাস আজোইনের রাসায়নিক গঠন আবিষ্কৃত হয়—যা রক্ত জমাট বন্ধকারী অংশ বলে চিহ্নিত হয়েছে। এলিসিনকে পানি ও এসিটোন দ্রাবকের মধ্যে গরম করে এটি নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়েছে। দেখা গেছে যে রক্ত জমাট বেঁধে রক্তনালী সরু হবার বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী এসপিরিন গ্রহণ যতখানি সক্রিয় আজোইন অন্তত ততখানি সক্রিয়।

পেঁয়াজের অশ্রু উদ্রেককারী অংশের রাসায়নিক গঠন বিক্রিয়াগুলোর সন্ধানও সাম্প্রতিক গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়েছে। পেঁয়াজ কাটলে এর গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয় প্রথমে একটা সালফেনিক এসিড পরে যা দ্রুত সত্যিকার অশ্রু উদ্রেককারী অংশে পরিণত হয়। এই অংশটি নিজেও আবার দ্রুত বিক্রিয়াশীল। এর পানিতে দ্রবীভূত হবার গুণটিও লক্ষ্যণীয়। এই কারণে প্রবহমান পানির নিচে পেঁয়াজ ছিললে বা কাটলে এই অংশটুকু ধুয়ে যেতে পারে বলে চোখের জ্বালা কম হয়। তা ছাড়া নিম্ন উত্তাপে এর বাষ্পীভূত হবার সম্ভাবনা কমে যায়। এ জন্য পেঁয়াজকে বরফে বা ফ্রিজে ঠাণ্ডা করে নিলে তা কাটতে সুবিধা। রসুন আর পেঁয়াজে জীবাণুনাশক ও ছত্রাকনাশক গুণাগুণগুলো তার নিজস্ব নিরাপত্তার খাতিরেই সৃষ্টি হয়েছে। অশ্রু উদ্রেককারী অংশও বিভিন্ন ক্ষতিকারী পশু পাখির কাছে অপ্রিয় বলে এতে নিরাপত্তার কাজে আসে।

রসুনের রক্ত জমাট বদ্ধকারী গুণ আজকাল স্বীকৃত বলে এর থেকে নানা রকম ওষুধ পত্র এখন তৈরি হচ্ছে। শুষ্ক যে রসুন গুড়া এই উদ্দেশ্যে তৈরি হয় কিছু পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা তাতে কিন্তু আজোইন বা অনুরূপ অংশগুলো খুঁজে পান নি। এর ভিত্তিতে যে সব পিল, ক্যাপসুল, তেল ইত্যাদি তৈরি হয় তাতেও আসল অংশটুকু খুঁজে পাওয়া যায় নি।

প্রধানত বাষ্পীয় পাতনের মাধ্যমে এসব তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয় বলে আসল অংশ নিষ্কাশিত হয় না। তাই আপাতত ওষুধ হিসেবে রসুন গ্রহণ করতে হলে তা তরতাজা রসুন হিসেবেই খাওয়া উচিত, অন্য প্রকারে নয়। পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ অবশ্য অনেক সময় একে তরতাজা খাবার থেকে বিরত রাখে। কিন্তু এটুকু সহ্য না করে উপায় নেই—স্বাদ বা ওষুধ পেতে হলে। এদের খাওয়ার পর তার রেশ মুখে এবং দেহে অনেকক্ষণ টের পাওয়া যাওয়ার কারণ হল সালফার কোষগুলো রক্তের মধ্য দিয়ে নিঃশ্বাস ও ঘামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই তাকে গ্রহণ করতে হলে এই উপস্থিতির বোধটুকু মেনে নিতে হবে বৈকি।





খাবারে মেশাল : ভাল মন্দ

টিনের খাবারের কৌটার গায়ে লেবেলটি পড়ে দেখুন। হয়তো লেখা রয়েছে ডিমের সাদা অংশ, ভেজিটেবল অয়েল, ক্রিম তোলা দুধ, লেসিথিন, ডাই গ্লিসারাইড, প্রপিলিন গ্লাইকিল মনোস্টিয়ারেট, সোডিয়াম সাইট্রেট, লিয়াসিন, রিবোফ্লোভিন"। বেশির ভাগ উপাদান সাধারণ খাবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, হয়তো আপনি চিনতেও পারছেন না জিনিসগুলো কি, তবুও জানা দরকার। এগুলো খাবারের মেশাল—ভেজাল নয়, মেশাল; হয় ইচ্ছে করেই মেশানো হয় খাদ্য মানের উন্নয়ন, খাদ্যকে আকর্ষণীয়করণ, খাদ্যের প্যাকেজিং ও সংরক্ষণের জন্য অথবা না চাইতেই এসে মিশেছে খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়ায়।

খাবারে মেশাল নতুন কিছু নয়। মানুষ যখন গুহায় বাস করত তখনও সংরক্ষণের জন্য গোশত বা মাছে লবণ মেশাত। লিখিত ইতিহাসের প্রথম থেকেই মেশালের চল দেখা যায়—স্বাদ-গন্ধের জন্য এবং সংরক্ষণের জন্য। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের খাদ্যাভাসে নানা রকম মেশাল জনপ্রিয় হয়েছে। আধুনিক নাগরিক সভ্যতায় খাবারে মেশাল একটি নতুন মাত্রা অবশ্য লাভ করেছে। এখানে নগরবাসীর জন্য খাদ্যকে টাটকা প্রাকৃতিকভাবে সরবরাহ করা যেমন দুরূহ হয়েছে তেমনি নাগরিক অভ্যাসে নানা রকম প্রক্রিয়াকৃত তাৎক্ষণিকভাবে প্রাপ্ত ও বিবিধ স্বাদ-গন্ধে সমৃদ্ধ খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ দেখা দিয়েছে। তার উপর খাদ্যের প্রস্তুতি ও পরিবেশন বড় শিল্পের বিষয়ে পরিণত হবার পর থেকে এর মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতায় খাদ্যকে আরো আকর্ষণীয়, আরো টেকসই করার চেষ্টা প্রত্যেকের মধ্যে জোরদার হয়েছে।

এর ফলে অন্য দিকে সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এবং সর্বসাধারণের মধ্যে বেশ কিছু উদ্বেগ। আপাতদৃষ্টিতে খাদ্যে সব মেশালের একটি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, একটি আকর্ষণও হয়তো রয়েছে। কিন্তু এর সবকিছু শরীরের জন্য নিরাপদ কি?

রাসায়নিকভাবে মেশাল বস্তুগুলো কি, এবং শরীরের উপর কি প্রভাব রাখে সে প্রশ্নটি উদ্বিগ্ন করার মত বৈকি।

পুষ্টি উপাদান বৃদ্ধি

খাবারে কেমিক্যাল আছে এই কথাটিতে অবশ্য কারো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। খাবার জিনিসটাওতো কেমিক্যালই। আর আমরা নিজেরাও তাই। কিন্তু প্রাকৃতিক খাবারের মধ্যে যে সব ক্যামিকাল সূক্ষ্ম মাত্রায় থেকে তাকে সমৃদ্ধ করে তোলে, তাই আবার যখন কৃত্রিমভাবে যথেচ্ছভাবে মেশাবার সুযোগ পায় তখন শরীরে নাও সইতে পারে। আবার অন্যদিকে প্রাকৃতিক হলেই খাবারটি আমাদের জন্য সর্বোত্তম এ কথাটিও সর্বত্র সঠিক নয়। অনেক মানুষের প্রাকৃতিক খাবারে কিছু জরুরি জিনিসের অভাব থাকে, সে অভাব পূরণ করতে তা মেশাল হিসেবে খাবারে দিয়ে দেয়াটাই ভাল।

যেমন আয়োডিনের কথাই ধরা যাক। আমাদের খাবারে খুব সামান্য পরিমাণে আয়োডিন থাকাটি অবশ্য প্রয়োজনীয়। নইলে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ঠিক মত কাজ করে না যার একটি ফলশ্রুতি গলগণ্ড রোগ। আয়োডিন সামুদ্রিক খাবারে প্রচুর থাকে। কিন্তু সমুদ্র থেকে বেশি দূরে যে সব জায়গা সেখানকার প্রাকৃতিক খাবারে ঐ সামান্য প্রয়োজনীয় আয়োডিনটুকুরও অভাব থাকতে পারে। আমাদের দেশের কোন কোন অঞ্চলে এ জন্য গলগণ্ড রোগের অধিক প্রভাব দেখা যায়। সাধারণ লবণের সামান্য একটু আয়োডিন মিশিয়ে নিয়ে সে লবণ খাবার অভ্যাস করলে এ ভয় আর থাকে না। আয়োডিন মেশানো লবণ আজকাল বাজারে পাওয়া যায়। কেউ যদি মনে করেন 'ক্যামিকাল' মেশানো জিনিস কি না কি হয়—সেটি ভুল হবে।

উন্নত দেশে গমকে প্রচুর প্রক্রিয়াজাত করে তারপর রুটি বানানো হয়। ফলে এর বেশ কিছু খাদ্য উপাদান—বিশেষ করে ভিটামিন বি (থায়ামিন, রিবোফ্লোবিন, নিয়াসিন) এবং লৌহের ঘাটতি ঘটে। এগুলো পরে ময়দার সঙ্গে মেশাল হিসেবে মিশিয়ে গুণ ঠিক রাখার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেছে সে প্রক্রিয়াজাত করে কোন কোন অংশ ফেলে না দিয়ে পুরো গমের আটার সমপরিমাণ খাদ্যমান অর্জন করা এত মেশাল দিয়েও সম্ভব হয় না।

স্বাদ বৃদ্ধি

লক্ষ্য করে দেখুন অনেক খাবার আপনি পছন্দ করেন মূল খাবারটির জন্য যতখানি নয়, এর মেশালের জন্যই বরং বেশি। আদা, রসুন, দারুচিনি, মিষ্টি, মিন্ট এরকম আপনার প্রিয় স্বাদ গন্ধের মেশালে মোড়া না থাকলে কোন কোন খাবার আপনি হয়তো ছুয়েও দেখবেন না। এর মধ্যে অনেক ক'টি প্রাকৃতিক মসলা সরাসরি মেশানো হয়। অনেক ক'টি প্রাকৃতিক উৎস থেকে আহরণ করা হয়—যেমন ভ্যানিলা আহরণ। আবার কেমিস্টরা অনেক ক্ষেত্রে স্বাদ গন্ধের জন্য দায়ী আসল কেমিক্যালটিকে নিজেরাই সংশ্লেষণ করতে সমর্থ হন, মূল প্রাকৃতিক বস্তুটির শরণাপন্ন না হয়ে। এতে বিকল্পটি

অনেক সময় স্বাদে-গন্ধে মূল জিনিসের সঙ্গে আলাদা করা যায় না। তবে প্রাকৃতিক জিনিসের রসায়ন যত জটিল ও সূক্ষ্ম হয়, সংশ্লেষণে তার সবকিছুর আনয়ন প্রায়শ সম্ভব হয় না।

স্বাভাবিকভাবেই প্রাকৃতিক জিনিসের সংশ্লেষিত রূপের প্রতি মানুষের একটি ভীতি আছে—ওটা কৃত্রিম, প্রাকৃতিক নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ভীতি অমূলক। প্রাকৃতিক ও সংশ্লেষিত উভয়ের মূল উৎস একই রাসায়নিক উপাদানে—ভাল হলে উভয়েই ভাল, মন্দ হলেও তাই। যেমন ভ্যানিলা ফ্লেভার প্রকৃতি থেকে আহরণ করেই নেয়া হোক, কিংবা কৃত্রিমভাবে সংশ্লেষিতই করা হোক—তার মূল উৎস ভ্যানিলিন নামক উপাদান। বরং কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন কৃত্রিমভাবে সংশ্লেষিত বস্তুরই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হবার সম্ভাবনা। কারণ এতে ঐ স্বাদ গন্ধ আনা হয় ন্যূনতম কেমিক্যাল উপাদান ব্যবহার করে—প্রকৃতিতে এর গঠন থাকে আরো জটিল।

এমন কিছু কেমিক্যাল বস্তু রয়েছে যা নিজে তেমন স্বাদু না হলেও অন্য খাবারের স্বাদ বর্ধনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। সাধারণ লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইড তার সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ। নিজের লবণাক্ত স্বাদ খুব প্রীতিকর না হলেও এটি খাবারের মিষ্টতা বাড়াতে এবং তিক্ত স্বাদ কমাতে সাহায্য করে। কোন কোন খাবারে তাই বেশি বেশি লবণ ব্যবহারেরও প্রবণতা আছে—যেমন আলুর চিপ্‌সে। সাধারণভাবে অনেক তৈরি খাবারে বেশি লবণ ব্যবহারের অভিযোগ আছে। অথচ উচ্চ রক্ত চাপে অবদান রাখে বলে অতিরিক্ত লবণ পরিহার করা উচিত বলে অনেক চিকিৎসক মনে করেন।

টেস্টিং সল্ট নামে পরিচিত মনোসোডিয়াম গ্লুটামাইট শহুরে সৌখিন খাবারে খুবই ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে চাইনীজ রেস্তোরার খাবারে এটি থাকাটা স্বাভাবিক। এ জিনিসটি খাবারে অতিরিক্ত থাকলে এমন কিছু উপসর্গের সৃষ্টি হয় যার নামই দেয়া হয়েছে চাইনীজ রেস্তোরা উপসর্গ। ল্যাবোরেটরি পরীক্ষায় পশুদের উপর প্রয়োগ করে এটি মস্তিষ্কে অসাড়তা সৃষ্টি করতে পারে বলে জানা গেছে। তাই আজকাল এ জিনিসটির অধিক ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

খাদ্য সংরক্ষণ

খাদ্য নষ্ট হয় প্রধানত জীবাণু বা ছত্রাকের কারণে। রুটি ও পনিরে প্রোপাইনিক এসিড অথবা তার সোডিয়াম বা ক্যালসিয়াম লবণ ব্যবহার করা হয় ছত্রাক বিরোধী হিসেবে।

সার্বিক এসিড ও বেনজয়িক এসিডেরও এরকম কার্যকারিতা রয়েছে। সোডিয়াম নাইট্রাইট দিয়ে গোশতকে জারালে সেটি ভাল থাকে, তার গোলাপী রং অক্ষুণ্ন থাকে। বিশেষ করে গোশত নষ্ট হয়ে বট্যুলিজম নামে বিষক্রিয়া ঘটাবার সম্ভাবনা এটি অনেক কমিয়ে দেয়। কিন্তু এই নাইট্রাইটও পেটে গিয়ে নাইট্রোসো যৌগ গঠন করতে পারে যা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী যৌগ হিসেবে চিহ্নিত। দেখা গেছে যে সব দেশে মানুষ অধিক পরিমাণে সংরক্ষিত গোশত খেতে অভ্যস্ত সেখানে পাকস্থলীর ক্যান্সারের পরিমাণও বেশি। অথচ শুধু বট্যুলিজম দূর করার জন্য যেটুকু নাইট্রাইট ব্যবহার করতে হয়,

গোশতকে সুন্দর গোলাপী রাখার জন্য ব্যবহার করতে হয় তার দশ গুণ বেশি। তাই ওটা কম ব্যবহার করলেও চলে।

শুকনা খাদ্য ভাল ও সুন্দর রাখার জন্য গন্ধকের ধোঁয়া বা সালফার ডাই-অক্সাইড দেয়া হয়। সালফার-ডাই অক্সাইড নিঃশ্বাসে গেলে বক্ষব্যাধির কারণ ঘটালেও খাদ্যের সঙ্গে নিলে এর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া শরীরের উপর দেখা যায়নি। প্রধানত অক্সিডেশনের কারণে তেল বা চর্বি নষ্ট হয়ে যায়। পর পর একটি চেইন রিয়্যাকশনের মাধ্যমে এটি ঘটে বলে একটি অক্সিজেন অণু অনেক ক'টি চর্বি অণুকে ভেঙে দিতে পারে। সেজন্য তৈল-চর্বিযুক্ত খাবার সংরক্ষিত করার জন্য তা বাতাস থেকে মুক্ত রাখতে হয়। সেটি পুরোপুরি সম্ভব নয় বলে এর সঙ্গে এন্টি অক্সিডেন্ট ব্যবহার করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এন্টি অক্সিডেন্ট ব্যবহারের ফলে এলার্জি সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। গর্ভাবস্থায় ইঁদুরকে এটি খাইয়ে রাসায়নিকভাবে অস্বাভাবিক বাচ্চার জন্ম হয়েছে বলে পরীক্ষার কিছু ফল প্রকাশিত হয়েছে। তাই কোন কোন এন্টি অক্সিডেন্টের উপর এখনো কাজ চলছে। এর মধ্যে বিএইচটি নামক একটি বহুল ব্যবহৃত এন্টি অক্সিডেন্ট নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

অথচ এই একই জিনিসের বেশ কিছু অন্য উপকারও পাওয়া গেছে যেটি রীতিমত চাঞ্চল্যকর। ইঁদুরকে বেশি পরিমাণে বিএইচটি খাইয়ে দেখা গেছে যে, তার আয়ুষ্কাল অনেক বেড়ে গেছে—মানুষের বয়সের হিসেবে যাকে ২০ বছর আয়ু বাড়া বলা যায়। মনে করা হচ্ছে যে প্রক্রিয়ায় এটি খাদ্যের বিনষ্টিকরণকে মন্থর করে একই প্রক্রিয়ায় জীবের কোষ অবক্ষয়কেও ধীর করে তোলে। এ ভাবে বুড়িয়ে যাবার কেমিক্যাল প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আরো জানা গেলে এরকম পথে হয়তো এক দিন মানুষের আয়ুষ্কালও বাড়ানো যাবে। কোন কোন বিজ্ঞানী বিএইচটি-এর অধিক ব্যবহারের সঙ্গে পাকস্থলীর ক্যান্সারের প্রকোপ কমে যাওয়ারও একটি কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন।

খাদ্যের রং

কোন কোন খাবার এমনিতেই আকর্ষণীয়ভাবে রঙিন। যে উপাদানের কারণে প্রকৃতিতে খাদ্য রঙিন হয় কৃত্রিমভাবে খাদ্য রাঙাবার জন্য সেটিও ব্যবহার করা যায়। যেমন বেটা কেরোটিন নামে হলুদ রং-বস্তু গাজরকে তার রং দেয় (তাই নাম ক্যারোট)। এই একই জিনিস মাখন, মার্জারিন ইত্যাদিকে হলুদ করতে ব্যবহৃত হয়। আমাদের শরীরে বেটা কেরোটিন ভিটামিন এ-তে পরিণত হয়। তাই এটি রঙ হিসেবেও মেশানো যায়, ভিটামিন বর্ধনের জন্যও মেশানো যায়—এদিক থেকে এ আদর্শ স্থানীয়। প্রাকৃতিক আরো যে সব রঙ উপাদান খাদ্য রাঙাতে ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে রয়েছে বীট, আঙুরের ছিলকা, জাফরান ইত্যাদি। অবশ্য কিছু কিছু রং বস্তু কৃত্রিমভাবে তৈরি—কেমিক্যালসে তৈরি এবং সেগুলো নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে। এদের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকটিকে একেবারে নির্দোষ বলা যায়।

মিষ্টিকারক

চিনি হচ্ছে পলি হাইড্রোক্সি যৌগ। পাশাপাশি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ আছে এ রকম অনেকগুলো যৌগেরই মিষ্ট স্বাদ রয়েছে। এমনকি এথিলিন গ্লাইকোল বেশ বিষাক্ত হয়েও মিষ্টি। অন্য কিছু পলি হাইড্রোক্সি যৌগও চিনির বদলে মিষ্টিকারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে—যেমন সরবিটল, জাইলিটল। ক্যালোরি মানের দিক থেকে এরা চিনির মত, কাজেই ক্যালোরি কমাতে এদের ব্যবহার করে ফায়দা নেই। কিন্তু এদের একটি বড় সুবিধা হল মুখের মধ্যে চিনির মত এদের অণু ভেঙে যায় না—ফলে দাঁত ক্ষয়ে যাওয়ার অবদান যোগাতে পারে না। দাঁতের জন্য ক্ষতিকর নয় এমন চুইংগাম তৈরিতে এরা উপযোগী। অবশ্য অধিক পরিমাণে সরবিটোল বা জাইলিটোল ডাইরিয়া ঘটাতে পারে।

স্থূলতা কমাবার জন্য বা কোন কোন অসুখে চিনির বিকল্প হিসেবে কৃত্রিম কিছু মিষ্টিকারক ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে স্যাকারিন ও সাইক্লামাইট বহুকাল ধরে পরিচিত। সত্তরের দশকে ক্যান্সারের সঙ্গে সম্পর্ক আবিষ্কৃত হবার পর এগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এ সম্পর্কে প্রমাণ স্পষ্ট না হওয়াতে এবং অন্য কোন বিকল্প না থাকাতে এদের সম্পর্কে পুরো আইনগত ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়নি। ১৯৮১ সালে এসপারটেম নামে আর একটি মিষ্টিকারককে অনুমোদন দেয়া হয় যা চিনির থেকে ১৬০ গুণ বেশি মিষ্টি।

খাদ্যে বিষাক্ত উপাদান

যুগে যুগে মানুষ কঠিন অভিজ্ঞতায় জানতে পেরেছে যে তাদের পছন্দসই খাদ্যের মধ্যেও কোন কোনটি বিষ বহন করে। উপাদেয় খাবার মাশরুমের কোন কোনটি বিষাক্ত। বিষাক্ত মাছ খেয়ে বিপদে পড়ার ঘটনা শুধু আমাদের দেশেই ঘটে না। প্রতি বছর ১০০ জনেরও বেশি জাপানি পাফার মাছ খেয়ে মারা যায়। এর কলজে ও ডিম্বাশয়ে বিষ থাকে বলে একে সঠিকভাবে কেটে কুটে নিতে হয়।

সবচেয়ে বিষাক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় ক্লোস্ট্রাইডিয়াম বোটুলিনাম নামের জীবাণুর দ্বারা। খাদ্যে স্বাভাবিক এক প্রক্রিয়াতেই এদের বৃদ্ধি ঘটতে পারে। তবে টিনের খাবারে বদ্ধ অবস্থায় এনোরোবিক বা অবাত পরিবেশে এরা খুব দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। টিনের খাবার যদি ভালভাবে জীবাণুশূন্য করে নেয়া না হয় তা হলে এ বিপদ ঘটার সম্ভাবনা থেকে যায়।

খাদ্য পুরো প্রাকৃতিক হলেই যে তা সর্বোত্তম হবে এমন কথা নয়। আবার কোন কিছু মিশাল না দিয়েও প্রক্রিয়াকৃত খাদ্য বিপজ্জনক হতে পারে।

ক্যান্সারের ভয়

খাদ্যের যে সব মেশাল নিষিদ্ধ ঘোষিত নয় তার কোনটি থেকে বিষময়তার ভয় নেই। তবে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদান এর মধ্যে রয়েছে কিনা সেটি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া

কঠিন। ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদান প্রাকৃতিক খাবারে যে থাকে না তাও নয়। কাঠ কয়লার আগুনে ঝলসানো গোশতে এমন উপাদান দেখা যায়। দারুচিনির মধ্যে বয়েছে স্যাফ্রোল ক্যান্সার উৎপাদনকারী হিসেবে কোন কোন পানীয়ের মধ্যে যার ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে। জমিয়ে রাখা চীনা বাদাম ও শস্যে এক রকম ছত্রাক জন্মাতে দেখা যায় যাতে এফ্ল্যাটক্সিন নামক যৌগগুলো থাকে। ক্যান্সার সৃষ্টিকারী হিসেবে এগুলোর ভয়ানক দুর্নাম রয়েছে। তাই বলে সব কাবাব, চীনা বাদাম, শস্যকে যেমন ভয় করে চলা যাবে না তেমনি ভয় করে চলা যাবে না খাদ্যের সব মেশালকে। তবে সাবধানের মার নেই, ক্ষতির সম্ভাবনা কোনটির কতখানি জেনে-শুনে অভ্যাস করা ভাল।

অনাহুত মেশাল

অসতর্কতা অনেক সময় খাবারের মধ্যে অনাহুত কেমিক্যালস নিয়ে আসে। অনেক সময় এটি ঘটে দুর্ঘটনাক্রমে। মাঝে মাঝে যখন এটি ধরা পড়ে বড় খবর হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব অগোচরেই থেকে যায়। এভাবে ফলের মধ্যে বিষাক্ত কীটনাশকের, মাছের মধ্যে ডিডিটির, মাছের মধ্যেই পারদঘটিত যৌগের, মুরগীর দেহে ও ডিমে পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল ইত্যাদির অত্যধিক মাত্রায় উপস্থিতি দেখে এক একবার মানুষ শঙ্কিত হয়ে উঠছে। আজকাল বিশেষ পদ্ধতিতে গোশতের জন্য গরু, ভেড়া, মুরগি পালন করা হয়। তাদেরকে এন্টিবায়োটিক, হরমোন ইত্যাদি মিশ্রিত খাবার খাওয়ানো হয় দ্রুত ওজন বৃদ্ধির জন্য। সাম্প্রতিক কালে এসব গোশত খেয়ে মানুষের মধ্যে ওষুধ ও হরমোনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেখা গেছে। এসব অনাহুত মেশালও যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

খাদ্যের মেশালের পুরো বিষয়টির জন্য যা দরকার তা হল বৈজ্ঞানিক সতর্কতা। ব্যবহৃত সব রকম মেশালের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ভালভাবে পরীক্ষিত হওয়া উচিত। একইভাবে খাবারে কিছু এসে মিশছে কিনা সেই ব্যাপারেও সব সময় বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। এমন একটি ব্যবস্থা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তখনই গড়ে তোলা যাবে যখন সাধারণ মানুষ সচেতন হবেন। তাঁরা যা খাচ্ছেন তার মধ্যে কি আছে এ প্রশ্ন তাঁরা তুলবেন,জানার চেষ্টা করবেন, কিন্তু অনাবশ্যকভাবে ভীতিগ্রস্ত হয়ে ভাল খাবারও পরিহার করবেন না।





রান্নার গুণে খাবারের স্বাদ

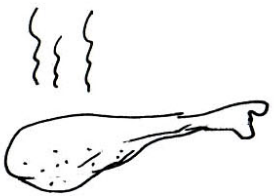
আজকাল উন্নত দেশে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে খাবার রাঁধার প্রচলন হয়েছে। আমাদের দেশেও যে কিছু কিছু না হয়েছে তা নয়। তবে এই ওভেনে রান্না করা খাবারে অনেকের মন ভরছে না কোথায় যেন স্বাদের পার্থক্য ঘটে যাচ্ছে এতে সাধারণ ওভেনের তুলনায়। কেন এমনটি হয় এই গবেষণা করতে গিয়ে আমাদের রান্নায় স্বাদ-গন্ধের মূলে কি সেই বিষয়টিই আরো খোলাসা হয়েছে।

সাধারণ রান্নায় সৃষ্ট স্বাদ-গন্ধের মূলে প্রধানত রয়েছে মাইলার্ড বিক্রিয়া নামে পরিচিত কিছু রাসায়নিক ঘটনা। প্রোটিনে যে এমাইনো গ্রুপ রয়েছে তার সঙ্গে খাদ্যের চিনির একটি জটিল বিক্রিয়া এটি। অনেক ক্ষেত্রে এটি চিনিকে খয়েরি রঙের ক্যারামেলে রূপান্তরিত করে, যেমনটি পাউরুটির উপরটায় দেখি। মাইলার্ড বিক্রিয়ায় প্রধানত তিন রকমের রিং আকৃতির যৌগ অণু সৃষ্টি হতে পারে যেগুলোকে খাবারকে ভাল স্বাদ দেয় থিওজোল, ফুরান এবং পাইরাজিন। থিওজোল প্রধানত বিশেষ মাংস-স্বাদ, ভুট্টা খইয়ের সুঘ্রাণ জাতীয় একটি স্বাদের জন্য দায়ী। ফুরান আনে ক্যারামেলের মিষ্টি স্বাদ, একটু বাদাম বাদাম অথবা মাখন জাতীয় স্বাদ-গন্ধ। কোন কিছু রোস্ট করলে যে এক আলাদা স্বাদের খোলতাই হয় তার সঙ্গে মিষ্টি বাদামী স্বাদ—এ সবের জন্য দায়ী পাইরিজিন।

আবার অন্য দিকে রান্নার এমনও কিছু রিং আকৃতির যৌগ তৈরি হতে পারে যেগুলো অবাঞ্ছিত কিছু স্বাদ-গন্ধের সৃষ্টি করে। এভাবে অক্সাজোল যৌগ এক ধরনের মেছো গন্ধ দেয় যা সাধারণত সবুজ শাক সব্জিতে পাওয়া যায়। থিওফেন দেয় অবাঞ্ছিত ধরনের পেঁয়াজ-গন্ধ, পোড়া বা রাবার গোছের স্বাদ। পাইরোল সৃষ্টি করে তীব্র ঝাঁঝালো অথবা সেদ্ধ ভুট্টা বা খড়ের মত এক রকম স্বাদ গন্ধ।

গবেষকরা সাধারণ ওভেনে এবং মাইক্রোওয়েভ ওভেনে কেক, মাংস ও সব্জি রান্না করে উভয় ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রাসঙ্গিক স্বাদ-গন্ধের যৌগগুলো বিশ্লেষণ করেছেন। আবার কম্পিউটারে অনুকরণে এ দুই ধরনের রন্ধন প্রক্রিয়ায় কি কি মাইলার্ড যৌগ উৎপন্ন হতে পারে তাও দেখা গেছে। উভয় ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, সাধারণ ওভেন এবং মাইক্রোওয়েভ ওভেন বিক্রিয়াগুলো ঠিক একভাবে ঘটে না। কেকের ক্ষেত্রে মাইক্রোওয়েভ ওভেনের কেকে স্বাদ-গন্ধদায়ী উদ্বায়ী বস্তু অপেক্ষাকৃত কম সৃষ্টি হয়েছে। যারা কেক খেয়ে দেখেছেন তাঁরাও নিশ্চিতভাবে বলেছেন এতে বাদামের ও ক্যারামেলের ঘ্রাণটি ঠিক আসেনি। অন্য দিকে এর মধ্যে এমন কিছু সব্জি সব্জি ভাব এসেছে যা কেকের জন্য বাঞ্ছিত নয়। গরুর গোশতকে উভয় ক্ষেত্রে সমান পরিমাণে রান্না হয়ে যাওয়া অবস্থায় যদি আনা হয়, তা হলে দেখা গেছে যে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে স্বাদ-গন্ধ দায়ী উদ্বায়ী বস্তু তৈরি হয়েছে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ।

গবেষকদের উপসংহার হল মাইক্রোওয়েভ ওভেনে রান্নাটি এত কম সময়ে ও কম উত্তাপে সম্পন্ন হয় যে তাতে মাইলার্ড বিক্রিয়া ঠিক সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। তবে খাবারের অম্লতা কমিয়ে এবং লবণের পরিমাণ বাড়িয়ে মাইক্রোওয়েভের খাবারের স্বাদ গন্ধ উন্নত করা যায়।





ঘ্রাণং অর্ধ ...

ঘ্রাণং অর্ধ ভোজনং আমাদের দেশে সনাতন প্রবাদ। ঘ্রাণের এই গুরুত্ব রসনার ব্যাপারে মানুষ চিরকালই অনুভব করেছে। শুধু এই অঞ্চলে নয় বিশ্বময়। তবে গুরুত্বটা কিন্তু শুধু রসনা তৃপ্তিতেই শেষ হয়ে যায়নি। মানব মনে এবং সাধারণভাবে প্রাণী জগতের নানা ক্ষেত্রে ঘ্রাণের ভূমিকাটি বেশ স্পষ্ট। এখন এর সুযোগ নিতে শুরু করেছে ব্যবসা জগত বৃহৎ আকারে।

ঘ্রাণ ছড়িয়ে খদ্দেরকে প্রলুব্ধ করার বিষয়টি নতুন নয়। আমাদের খাদ্য ভেজালের একটি দিক বরাবরই ছিল কৃত্রিম ঘ্রাণ দিয়ে মানুষকে প্রবঞ্চিত করার মধ্যে; যেমন সরষের তেলের ক্ষেত্রে। কিন্তু এর উল্টোটাও ছিল। শহরের নামকরা রুটির তন্দুর যেখানে তার আশেপাশে ঘোরাঘুরিটাও কম তৃপ্তিদায়ক ছিল না-তন্দুর থেকে বের করা টাটকা রুটির ঘ্রাণে এমনই আকর্ষণ। এতে সেই বেকারীর ব্যবসাও যে ভাল হতো সেটা বলা বাহুল্য। কিন্তু এই ঘ্রাণে, এই সাফল্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। ইউরোপে যাঁরা বিশ ত্রিশ বছর আগে গিয়েছেন গ্রোসারী দোকানগুলোর সামনে তাঁদের থমকে দাঁড়াতে হয়েছে সদ্য রোস্ট করা কফি বীন গুড়ো করার ঘ্রাণে আকৃষ্ট হয়ে। এক্ষেত্রে অবশ্য শুধু ঘ্রাণ নয়, দৃশ্যটিও প্রলুব্ধকারী। বড় কাঁচের জানালার সঙ্গে থাকতো এই নয়নভরা কফি, গ্রাইন্ডিং মেশিন লালে সোনালিতে চকমকে এনামেল করা যায় গাত্র। উপরে বড় কাঁচ পাত্র থেকে কেমন করে সদ্য রোস্ট করা কফিবীন পড়েছে, কেমন করে ধীর গতি মোটরে পরিচালিত গ্রাইন্ডারে তা গুড়ো হচ্ছে, প্যাকেটে গিয়ে জমা হচ্ছে সবই ছিল দারুণ দর্শনীয়। কিন্তু ঐ ঘ্রাণটিই ছিল অমন, রীতিমত মনমাতানো। এই আয়োজনের পেছনে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য

অবশ্যই ছিল, কিন্তু এতে কৃত্রিমতা ছিল না। ঐ কফি বীন, ঐ গন্ধ ছিল ষোল আনাই খাঁটি, যেমন ছিল তন্দুর থেকে বের করা রুটির গন্ধ।

এখন ঘ্রাণের বাণিজ্যিকীকরণটিতে এক নতুন মাত্রা—আসছে এবং যথারীতি এতে নেতৃত্ব দিচ্ছে জাপান। এতে ঘ্রাণের ব্যবহারটি হচ্ছে বৃহদাকারে কিন্তু বিপণন হচ্ছে যে পণ্য তার সঙ্গে এই ঘ্রাণের কোন যোগাযোগ নেই। আর এটি রসনা শিল্পের মধ্যেও সীমাবদ্ধও নেই। ধরা যাক, ইউরোপ আমেরিকার একটি ট্রাভেল এজেন্টের দোকান—এতে নতুনপ্রযুক্তি ছড়িয়ে রেখেছে সঠিক মাত্রায় নারকেল তেলের সুরভি আর নানা বর্ণালী পোস্টার হাতছানি দিচ্ছে সাগর দ্বীপে নারকেল সুশোভিত তটে রৌদ্র স্নানার্থে ভ্রমণের। সব্জির দোকানে ভুর ভুর করছে সদ্য কাটা ঘাসের ঘ্রাণ অথবা মোটর গাড়ির শো রুমে অত্যন্ত দামী চামড়ার ঘ্রাণ যাতে উঁচু মানের গাড়ির অভ্যন্তরের আবহ সৃষ্টি করে। বলাবাহুল্য এর সবই কৃত্রিম—আসল জিনিস থেকে এ গন্ধ নির্গত হচ্ছে না। কিন্তু তবুও ক্রেতা প্রলুব্ধ হচ্ছে।

ঘ্রাণ যে মানুষের মন মেজাজ, আবেগ এবং সেই সঙ্গে তার আচরণকে অনেকখানি প্রভাবিত করে সে কথা যেন মানুষ নতুন করে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। এখানে মানুষ আর দশটি প্রাণী থেকে যে ভিন্ন নয় এ কথা বুঝতে এত দেরি হবার কথা ছিল না। স্যামন মাছ (এবং খুব সম্ভব আমাদের ইলিশও) দীর্ঘক্ষণ সমুদ্রে কাটাবার পর মিঠা পানিতে জন্মস্থানে ফিরে যায় অদ্ভুত এক স্মৃতির পরিচয় দিয়ে। এটি সম্ভব হয় শৈশবে ঠিক তার জন্মস্থানের আশপাশের প্রাণী, জলজ উদ্ভিদ, খনিজ সবকিছু মিলিয়ে যে একক গন্ধ সেটি তার মস্তিষ্কে বিধৃত হয়ে থাকে। সেই গন্ধ শুঁকে শুঁকেই সে ফিরে যায় সঠিক জায়গায়। তেলাপিয়ার যে সব মাছ বাচ্চাদেরকে মুখের ভিতর রেখে বড় করে তারা কিন্তু গন্ধ দিয়েই যার যার বাচ্চা চিনতে পারে। ভয় পেলে কোন কোন মাছ বিশেষ গন্ধ ছড়িয়ে অন্যদেরকে সতর্ক করে দেয়। স্তন্যপায়ী পশুর অনেকেই নিজ নিজ এলাকার উপর আধিপত্য ঘোষণা করে তার বিশেষ গন্ধ দিয়ে সীমানা সুনির্দিষ্ট করে। এই গন্ধ অন্যদেরকে দূরে থাকতে সাবধান করে দেয়। ওরা এদিক ওদিক সরে গেলেও শেষ পর্যন্ত তার নিজের পালে যোগ দিতে পারে ঐ দলের একটি সামগ্রিক বিশেষ গন্ধ শুঁকে। পুরুষ বানরের নাক বন্ধ করে দিলে দেখা যায় তার আর স্ত্রী বানরের প্রতি কোন আগ্রহ থাকে না।

মানুষের জীবন অবশ্য অতখানি ঘ্রাণ নিয়ন্ত্রিত নয়। তবুও ঘ্রাণ তার আবেগ আর আচরণকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে বৈকি। যেমন স্ট্রবেরী ফলের ঘ্রাণ তৈরি হয় ৩৫টি বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণে। ধরা যাক, ফলটিকে পিষে দেয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে ঐ রাসায়নিক দ্রব্যগুলোর দু'একটির মধ্যে পরিবর্তন হয়ে ঘ্রাণে যে সূক্ষ্ম পরিবর্তন আসে তা মানুষের নাক টের পায়। কাজেই মানুষের নাককেও অবহেলা করা যায় না—যেমন করছে না আজকের বৃহৎ বাণিজ্য।



টেস্টিং সল্ট কাহিনী

চাইনিজ খাবার তৈরি করতে মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট নামে যে লবণ ব্যবহার করা হয় তার ক্ষতিকর দিক নিয়ে বহুদিন ধরে বহু বিতণ্ডা চলেছে। রান্নার সময় সামান্য পরিমাণে ব্যবহৃত এই উপাদান সাধারণত টেস্টিং সল্ট নামে পরিচিত। এ সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম গবেষণাপত্র দাবি করছে যে পুরো ব্যাপারটিই কতকগুলো মনস্তাত্ত্বিক অভিযোগের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে, সঠিক শারীরবৃত্তীয় ঘটনায় নয়।

টেস্টিং সল্ট চাইনীজ খাবারে ব্যবহৃত হয় এর স্বাদগন্ধের মান বাড়াবার জন্য। গ্লুটামিক এসিডের মনোসোডিয়াম সল্ট হিসেবে এটি আমাদের শরীরের সাধারণ পরিপাক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। আমরা নিজেরাই আমাদের শরীরে এটি তৈরি করি—অন্যান্য প্রাণীরাও করে। মাছ-মাংসের মধ্যে একটি নিত্য উপাদান হিসেবে আমরা সব সময় এটি পাচ্ছিও। কাজেই এ রকম একটি জিনিসের প্রতি কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া শরীরে থাকবে, সেটি বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

কাহিনীর শুরু ১৯৬৮ সনের এপ্রিল মাসে। জনৈক রর্বাট হো ম্যান কোক নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিনে প্রকাশ করেন যে, যখনই তিনি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে খান তখনই অদ্ভুত কিছু লক্ষণ তাঁর শরীরে দেখা দেয়। ঘাড়ের পেছন থেকে শুরু করে এক রকম অবসাদ তাঁর হাতে ও পিঠে ছড়িয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলতা দেখা দেয় ও নাড়ী দ্রুততর হয়। তিনি অনুমান করেন চাইনিজ খাবারে ব্যবহৃত কুকিং ওয়াইন, অতিরিক্ত লবণ অথবা মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট এর জন্য দায়ী। তাঁর প্রবন্ধটি প্রকাশের পর এ রকম আরো বেশ কিছু ঘটনার কথা জানা যায় এবং ক্রমে মনোসোডিয়াম গ্লুটামেটকেই এ জন্য দায়ী করা হতে থাকে। ১৯৬৯ সালে 'সায়েন্স' পত্রিকায় এ সম্পর্কে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয় 'মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট এর শরীরগত প্রভাব এবং চাইনিজ

রেস্টুরেন্ট সিনড্রোমে এর ভূমিকা'। বলাবাহুল্য পূর্ব প্রকাশিত ঐ লক্ষণগুলো ইতিমধ্যে চাইনিজ রেস্টুরেন্ট সিনড্রোম (সংক্ষেপে সি. আর. এস) নামে পরিচিত হয়েছে। এই প্রবন্ধের মতে টেস্টিং সল্ট খাবার ১৪ মিনিটের মধ্যে লক্ষণগুলো দেখা দেয়' এবং ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে চলে যায়। তবে এর মতে এসব লক্ষণ পুরাপরি দেখা যাবার ঘটনা অতি বিরল। তা ছাড়া প্রবন্ধটির সিদ্ধান্তগুলোকে ভিত্তি করা হয়েছে খুব কমসংখ্যক নমুনার উপর।

ঐ বছরের ঐ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় যে নবজাত ইঁদুরের মধ্যে গ্লুটামেট ইনজেকশন দিয়ে ঢোকানো হলে তার মস্তিষ্কে বিশেষ ঘা এর সৃষ্টি হয়। এর পরপর অবশ্য তিনটি ভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে যে মুখে খাওয়া গ্লুটামেটের দ্বারা নবজাত ইঁদুরেরও কোন কিছু হয় না আর পূর্ণবয়স্ক ইঁদুরের ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই মস্তিষ্কের ঐ ঘা হয় না। অপরপক্ষে ১৯৭০ সনে সায়েন্স পত্রিকার এক রিপোর্টে দেখা যায় যে দৈনিক ১২০ গ্রাম করে বহু দিন ধরে গ্লুটামেট খেয়েও মানুষের মধ্যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি বরং কিছু রক্ত চাপ হ্রাস ও রক্তে গ্লুকোজ মাত্রা হ্রাসের মধ্যে উপকারী প্রভাবই দেখা গেছে। ১৯৭৮ সনের এক পরীক্ষায় অত্যন্ত ভারী ডোজে গ্লুটামেট খাইয়ে ও বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে কোন বিরক্তের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭৯ সনে আর একটি সমীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। এতে দেখা যায় যে, শতকরা ৪৩ জন ব্যক্তি সাধারণত যে কোন খাবারের পরেই কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে শতকরা ১.৮ জন সি. আর. এস-এর মত লক্ষণে ভোগেন। আর তাঁদের মধ্যেও শতকরা মাত্র ০.০২ জন এসব লক্ষণে ভোগেন চাইনিজ খাবার খাওয়ার পর। আরো মজার ব্যাপার হল যাঁরা সি, আর, এস সম্বন্ধে আগে শুনেছেন ভুক্তভোগীদের মধ্যে তাঁদের সংখ্যা যাঁরা শুনেননি তাঁদের দশ গুণ।

এ সব নানা ধরনের পরীক্ষা ও সমীক্ষার ভিত্তিতে সম্প্রতি কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করছেন পুরো ব্যাপারটিই আসলে মনস্তত্ত্বিক। সরল বিশ্বাসী রোগীর সঙ্গে সরল বিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের যোগ হওয়ার ফলশ্রুতিতেই টেস্টিং সল্টকে এভাবে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। আসলে এর সত্যিকার কোন দোষ নেই।





রান্নার রসায়নে ভালমন্দ

নতুন স্যাঁকা রুটির সুঘ্রাণ, ভূনা গোশতের আলাদা স্বাদ, মুড়ি ভাজার লোভনীয় রং এ সবের কারণ হল রান্নার ঐ বিশেষ কায়দার মধ্যে সংঘটিত বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া। এ সব বিক্রিয়ায় এমন কিছু যৌগ তৈরি হয় যা স্বাদ, ঘ্রাণ, রং ইত্যাদিতে অবদান রাখে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটি শুধু এতেই সীমাবদ্ধ নয়। নতুন সৃষ্ট এই যৌগগুলো খাদ্যের পুষ্টি গুণের উপরও প্রচুর প্রভাব রাখে; এমনকি এর কোন কোনটি খাদ্যকে বিষময়ও করে তুলতে পারে।

জার্মান বিজ্ঞানীদের গবেষণায় রান্নার মধ্যে সংঘটিত মাইলার্ড বিক্রিয়া নামে পরিচিত কিছু বিক্রিয়াকে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এ বিক্রিয়ায় যে সব যৌগ তৈরি হয় তার তাৎপর্য খুবই গুরুত্ববহ বলে প্রমাণিত হয়েছে। চিনির অণু যখন প্রোটিনের উপাদান এমাইনো এসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তখনই এ সব যৌগ তৈরি হয়। স্যাঁকা খাবারের যে সুঘ্রাণ তা ফুর‍্যানোন নামক যৌগ দ্বারা সৃষ্টি হয়—সেটি এই মাইলার্ড বিক্রিয়ার ফলশ্রুতি। আবার পাউরুটির উপর যে বাদামী আস্তরণ সেটিও এরই ফলে সৃষ্ট। এ ধরনের অনেকগুলো যৌগের সামগ্রিক নাম আমাদোরী যৌগ।

আমাদোরী যৌগের সৃষ্টিতে এমাইনো এসিড প্রয়োজন যা প্রোটিনের উপাদান এবং পুষ্টির জন্য অতি প্রয়োজনীয়। রান্নার মাধ্যমে বা অন্যান্য প্রক্রিয়াকরণে এ যৌগ বেশি সৃষ্টি হলে জরুরি এমাইনো এসিডে ঘাটতি পড়ে। আবার ট্রিপটোফ্যান এমাইনো এসিড রান্নার সময় আমাদোরী যৌগ সৃষ্টি করে না। কিন্তু সেটি আরো ক্ষতিকর কিছু যৌগ তৈরি করে যা ক্যানসার সৃষ্টিতে সক্ষম। রান্নায় উত্তাপ ১৩০° সেলসিয়াসের উপরে উঠলে এগুলো তৈরি হবার সম্ভাবনা বাড়ে। যে সব দেশে স্বল্প রান্নার রীতি প্রচলিত—যেমন জাপানে বা চীনে—যেখানে কোন কোন ক্যানসারের প্রাদুর্ভাব কম দেখা যায়।

খুব সম্ভব এ সব যৌগ সৃষ্টি না হওয়াটাই কারণ। অধিক সিদ্ধ বা অধিক ভাজা বা রোস্ট করা খাবারের অভ্যাস এদিক থেকে মোটেই ভাল নয়।

অবশ্য মাইলার্ড বিক্রিয়ার সবই খারাপ এমন নয়। সদ্য স্যাঁকা রুটির মন মাতানো ঘ্রাণ, রোস্ট করা মুরগীর এমন আকর্ষণীয় বাদামী চেহারা কখনোই হতো না। তা ছাড়া মাইলার্ড বিক্রিয়ার এমনো কিছু যৌগ পাওয়া গিয়েছে যা বরং ক্যানসার সৃষ্টির প্রবণতা রোধ করে। বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য হচ্ছে এর খারাপ দিকগুলো প্রতিরোধ করে ভাল দিকগুলো কি করে বজায় রাখা যায় তা উদ্‌ঘাটন করা।





বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও বৈজ্ঞানিক সমাধান রান্নাঘরের কিছু নিত্য নৈমিত্তিক কাজে বেশ লেগে যায়। বিষয়গুলো সাধারণ মনে হলেও অনেক সময় যথেষ্ট মন খারাপ আর খিটিমিটির কারণ ঘটাতে পারে। অথচ কত সহজেই না এগুলো এড়ানো যায়।

অক্ষত সেদ্ধ ডিম

সেদ্ধ করতে গিয়ে ডিম ফেটে গেছে, ভেতরে পানি ঢুকেছে, ডিমের আঁকাবাঁকা রেখা ডেগচিতে ছড়িয়ে পড়েছে এমন ঘটনা দেখতে কার ভাল লাগে। তাই ওটা নিয়েই শুরু করা যাক। ডিমের খোলসের ভেতরটা পুরো তরল পদার্থে ভর্তি নয়—এর মধ্যে খানিকটা জায়গা জুড়ে থাকে বাতাস, ডিমের যে প্রান্ত বড় সেখানে অতি ক্ষুদ্র কিছু ছিদ্র খোলসের মধ্যে থাকে। সেদ্ধ করার সময় বাতাস গরম হয়ে এর চাপ বাড়লে ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়ে তা বের হয়ে যায়। কিন্তু অতি তাড়াতাড়ি গরম করতে গিয়ে বাতাস দ্রুত এত ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বের হয়ে সেরে উঠতে পারে না। তখন তার চাপে খোলস ফাটে, পানি ঢুকে, নরম ডিম বের হয়ে আসে।

সেদ্ধ করার ঠিক আগে খোলসের বড় প্রান্তে পিন দিয়ে যদি একটি ছিদ্র করে দেওয়া হয় তা হলে ওটা দিয়েই বাতাস বেরিয়ে যেতে দেখা যাবে। ফাটা বন্ধ করার এটি একটি উপায়।

ফ্রিজ থেকে বের করা খুব ঠাণ্ডা ডিম হঠাৎ গরম পানিতে পড়লেও খোলস ফেটে যেতে পারে। ঠাণ্ডা ডিম সাধারণত পানিতে ডুবিয়ে স্বাভাবিক উত্তাপে নিয়ে আসলে এটা হবে না। সেদ্ধ করার সময় পানিতে একটু লবণ ছিটিয়ে দিন। এটি অবশ্য ফাটা

ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু ফাটার পর ফাটল বন্ধ করতে সাহায্য করবে। তরল ডিম লবণ পানির সংস্পর্শে আসা মাত্র তাড়াতাড়ি জমে গিয়ে ফাটল বন্ধ করে দেবে। পানি ঢোকার অথবা ডিম বের হয়ে আসার সম্ভাবনা কমে যাবে।

ডিমের কুসুমে আস্তরণ

সেদ্ধ করা ডিম পাতে আসলো। ভেঙে দেখা গেল কুসুমের গায়ে বিশ্রী সবুজ-ছাই রঙের আস্তরণ। ডিমের প্রতি আপনার আকর্ষণটাই নষ্ট হয়ে গেল। একটু সাবধান হলেই এটি এড়ানো যেত।

ডিম গরম হবার সময় হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস তৈরি হয়। পরে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হবার সময় এই গ্যাসের সঙ্গে ডিমের কুসুমে থাকা আয়রনের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। হাইড্রোজেন সালফাইডের হাইড্রোজেন চলে যায়, সালফারটুকু আয়রনের সঙ্গে কালচে আয়রন সালফাইড গঠন করে কুসুমের সঙ্গে লেগে থাকে। তাই সেদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করে নিলে ঐ আস্তরণ জমতে পারে না—ডিমের কুসুম থাকে সুন্দর হলদে রঙের।

তালগোল পাকানো ন্যুডল্‌স

ন্যুডলসের ব্যবহার আজকাল আমাদের রান্নাঘরে বাড়ছে। তা ছাড়া একই রকম আরেকটা জিনিস সেমাই। এ সব রাঁধতে একটি বিপত্তি প্রায়ই ঘটে—তা হল পরস্পরের গায়ে সেটে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে যাওয়া। এ রকম ন্যুডল্‌স বা সেমাই দেখতে খেতে মোটেই ভাল লাগে না। গায়ে গায়ে লেগে যাওয়ার কারণ হল ময়দার তৈরি এসব জিনিসের গায়ে যে আলগা ময়দা থাকে সেদ্ধ করার সময় সেটা আঠা তৈরি করে।

ঐ আলগা ময়দাটুকু দূর করতে পারলে এটি ঘটবে না। সেদ্ধ করার পরপর গরম পানিতে ধুয়ে নিলে এর একটি সুরাহা হয়। আরো দুটো পথ অবশ্য আছে। একটি হল অনেক বেশি পানিতে এদের সেদ্ধ করা। এতে সেদ্ধ ন্যুডলসে লেগে থাকার মত আলগা ময়দা বেশি থাকবে না কারণ পানিতে ছড়িয়ে তার অনেকখানি বিস্তৃত হয়ে যাবে; অন্য উপায়টি হল তেলে বনস্পতিতে বা বাটার অয়েলে রান্না করা। পানিতে সেদ্ধ করার সময়ও অন্তত কিছু তেল দিয়ে দিলে এদের গায়ে তেলের আবরণ পরস্পরের সঙ্গে লাগতে বাধা দেবে। এভাবে পাওয়া যাবে ঝরঝরে ন্যুডল্‌স বা সেমাই।

রসুন-পেঁয়াজের নিয়ন্ত্রণ

খাবারকে আমরা হয়তো রসুনগন্ধী করতে চাই—কিন্তু কতখানি? অনেক সময় অতিরিক্ত রসুনগন্ধী হলে ভাল লাগে না। আবার কখনো অনেক রসুন দিয়েও রসুনের স্বাদ-গন্ধ পাই না। এটি নিয়ন্ত্রণের উপায় কি?

রসুনের রয়েছে এলিনিন নামের দ্রব্য আর এলিনেজ নামের একটি এনজাইম। এই দুটি একত্র হলেই রসুন-গন্ধের সৃষ্টি হয়। কোয়ার ভেতরে রসুন অন্য সব উদ্ভিদের মত

অসংখ্য জীবকোষে বিভক্ত থাকে। এদের কোষ দেয়াল অক্ষত থাকলে ঐ রাসায়নিক মিশ্রণ ঘটে না, রসুন গন্ধেরও সৃষ্টি হয় না। রান্নার সময় খাবারে মেশাবার আগে-রসুনের কোয়াকে যত কাটা হবে, বা ছেঁচা হবে কি পেষা হবে তত অধিক সংখ্যায় তার কোষ দেয়াল ভাঙ্গবে, আর গন্ধ বেরোবে তত বেশি। এখন আপনিই ঠিক করুন খাবারকে কতখানি রসুন-গন্ধী করতে চান। যত বেশি চান তত বেশি করে রসুনকে কাটুন বা পিষুন। খাবারে দিয়ে ফেলার পর যদি মনে করেন ওটা একটু বেশি হয়ে গেছে, তারও উপায় আছে। রান্নাটা একটু বেশি করে করুন, রান্না এনজাইমের বিক্রিয়াটি কমিয়ে ফেলে।

পেঁয়াজও রসুনের মত একই দলের উদ্ভিদ। কাটা বা পেষার উপর এর এ ঝাজ খুব নির্ভর করে। তা ছাড়া এর ক্ষেত্রে বিক্রিয়াটি চোখে জ্বালা ধরায়, অশ্রু ঝরায়। তাই পেঁয়াজের কাটা বা পেষা যত বেশি করবেন চোখের অসুবিধা তত বেশি হবে। কাজগুলো কল থেকে ঝরছে এমন পানিতে ধরে করতে পারলে আপনার কান্না কম হবে। এতে বিক্রিয়ার অণুগুলো ধুয়ে যাবে, বাতাসে ছড়িয়ে আপনার চোখে আসতে পারবে না।

কপি-শালগমের অপ্রিয় গন্ধ

ফুল কপি, বাঁধা কপি, শালগম—এ সব মৌসুমের প্রিয় খাবার। এমন প্রিয় খাবারও রান্নার সময় সৃষ্ট এক অপ্রিয় গন্ধের কারণে অনাকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। এর একটি বিহিত হওয়া প্রয়োজন।

অপ্রিয় গন্ধটির কারণ হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস যেটি পঁচা ডিমের গ্যাস নামেও পরিচিত। এ সব সব্জিতে এমন কিছু যৌগ থাকে যা রান্নার সময় এই গ্যাসের সৃষ্টি করতে পারে। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হল রান্না দ্রুত করা। অনেকখানি পানি ডেগচিতে আগে থেকেই সেদ্ধ করতে থাকেন। এমন অবস্থায় এতে সব্জি ছেড়ে দিলে খানিকক্ষণ শান্ত হয়ে চট করে আবার তা ফুটতে আরম্ভ করবে। ফলে গন্ধ সৃষ্টির সুযোগ ঘটবেনা।

খোসা ছাড়ানো ফলের রং

কলা, আপেল এরকম কিছু ফল খোসা ছাড়িয়ে বা কেটে বেশিক্ষণ রেখে দিলে উন্মুক্ত অংশ খয়েরী রং ধারণ করে বিশ্রী হয়ে যেতে পারে। এদের মধ্যে এমন কিছু যৌগ থাকে যা বাতাসের সংস্পর্শে আসলে অক্সিডাইজ্ড হয়ে যায়—রংটি এরই ফল।

ছিলার বা কাটার পরেই বাতাসের সংস্পর্শে যৌগগুলো আসতে পারে। কাটা বা ছিলা জায়গায় লেবুর রস আনারসের রস বা সিরকা ছিটিয়ে দিলে ঐ বিক্রিয়াটি ঘটতে পারে না। ক্রিম, মেয়োনীজ বা অন্য কোন সস্ মেখে দিলেও একই হয়।

মুচমুচে পেটীজ, পাই

পেটীজ বা পাই তৈরি করার সময় সবার লক্ষ্য থাকে উপরের ময়দার আবরণটি খেতে মুচমুচে হোক। এর জন্য ছোট ছোট চিলতে ফ্লেক ময়দার খমীরের সাথে মেশানো হয়। খমীরটা এমন শক্ত করতে হবে যেন বেলার সময় ছিড়ে না যায়, আবার ফ্লেকগুলো খমীরের সারা গায়ে সমানভাবে মেশে।

খমীর তৈরি করার সময় ফ্লেকগুলো গলে গিয়ে এর মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তাই যদি হয় তা হলে পেটীজ হবে শক্ত—মুচমুচে হয়ে পরতে পরতে উঠে আসবেনা। এ জন্য খমীরকে প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা দিতে হবে, আর এটি যত ঠাণ্ডা থাকে তত ভাল। ময়দা মাখার আগে পাত্র, চামচ, বেলোন ইত্যাদি সব ঠাণ্ডা করে নেয়া দরকার। কাজ করতে হবে বরফ পানি দিয়ে। খমীরের মধ্যে আঙুল গিয়ে যাতে এর উত্তাপ না বাড়ে সে জন্য পানি মেশানোর জন্য কাঁটা চামচ ব্যবহার করা যায়। বেলার আগে খমীরকে আবার হিম-শীতল করে নিতে হবে।

এত সাবধান হলে তবেই চমৎকার মুচমুচে পেটীজ বা পাই-এর নিশ্চয়তা পাওয়া যেতে পারে।





দুধের বিজ্ঞান

আমাদের শ্রেষ্ঠতম খাদ্যগুলোর মধ্যে দুধ অন্যতম। প্রাণিজ আমিষের উৎস হিসেবে ডিমের পরেই এর স্থান। দুধের উৎসের উন্নয়নেও দুনিয়া অনেক এগিয়ে গেছে, যদিও আমাদের দেশে এখন দুধ সহজলভ্য নয়। বৈজ্ঞানিকভাবে উন্নত জাতের এমন গাভীরও এখন গড়ে তোলা হয়েছে যার প্রত্যেকটি বছরে ৪,০০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত দুধ দিতে পারে।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর বাচ্চা জন্মাবার পর পর তার স্তনে আসে দুধ, বাচ্চার প্রাথমিক খাদ্য হিসেবে। খুব ছোট শিশুর মায়ের দুধ পানের কথা বাদ দিলে গরুর দুধই সারা দুনিয়ায় মানুষের একটি প্রধান পানীয়। কাজেই আমরা এখানে গরুর দুধের কথাই বিশেষ করে আলোচনা করবো। প্রথমে দেখতে হবে দুধের মধ্যে কি রয়েছে?

দুধের অধিকাংশই, শতকরা প্রায় ৮৭ ভাগ পানি। এর সাথে মিশানো রয়েছে আমিষ, চিনি, প্রায় সব রকমের ভিটামিন, তৈল জাতীয় পদার্থ এবং লবণ। দুধে ক্যালসিয়ামের আধিক্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। হাঁড়ের গঠনের জন্য প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকতে হবে বৈকি।

দুধ হল এমন একটি মিশ্র দ্রব্য যাকে বলা হয় ইমালশন। একটি তরল যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোটার আকারে অন্য একটি তরলের মধ্যে ছড়ানো থাকে তখনই তাকে বলা হয় ইমালশন। দুধে আমিষপূর্ণ পানির মধ্যে চর্বির ক্ষুদ্র ফোটাগুলো এমনিভাবেই ছড়িয়ে থাকে। তবে চর্বির অপেক্ষাকৃত বড় ফোটাগুলো দুধের উপরের দিকে ভেসে উঠে যাকে আমরা বলি ক্রিম অর্থাৎ ননী। চর্বি পানি অপেক্ষা হাল্কা বলেই এমনটি ঘটে। এই ক্রীমের যে হাল্কা হলুদ রং তার কারণ এতে থাকে কেরোটিন নামে এক ধরনের রং-বস্তু। অন্যথায় দুধের রং একেবারেই সাদা। মজার ব্যপার হল অম্লতা বা ক্ষারত্বের দিক থেকে

দুধকে একেবারে নিরপেক্ষ বলা যাবে না—এটি অতি সামান্য পরিমাণে অম্ল বা এসিডিক।

দুধের প্রধান যে আমিষ সেটি হল ক্যাসিন। ক্যাসিনের অণুর বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এর মধ্যে রয়েছে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব রকমের এমাইনো এসিড। দুধের শতকরা প্রায় ৩$\frac{১}{২}$ ভাগ আমিষ, যার আবার দুই-তৃতীয়াংশই ক্যাসিন। রেনিন নামক এক রকম এনজাইম রয়েছে যা ক্যাসিনকে দুধ থেকে আলাদা করে জমাট বাঁধিয়ে দিয়ে থাকে। বিশেষ করে স্তন্যপায়ী শিশুর পাচক রসে এই এনজাইমটি থাকে।

দুধের মধ্যে যে ধরনের চিনি থাকে তাকে বলা হয় ল্যাকটোজ। গ্লুকোজের একটি অণু এবং গ্যালাক্টোজের একটি অণুর সমন্বয়ে গঠিত বলে এটি ডাই-স্যাকারাইড ধরনের চিনি। গরুর দুধে এই চিনি থাকে শতকরা ৫ ভাগের সামান্য কম।

বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর দুধের গঠনে তফাৎ রয়েছে যার যার বাচ্চার বৃদ্ধির প্রয়োজন অনুসারে এটি হয়। যেমন গরুর দুধে থাকে মানুষের দুধ অপেক্ষা অধিকতর আমিষ এবং ক্যালসিয়াম। গরুর বাচ্চাকে শারীরিক দিক থেকে বেশি দ্রুত গড়ে উঠতে হয় বলেই এই ব্যবস্থা। অন্য দিকে মানুষের দুধে ল্যাকটোজ চিনি থাকে বেশি—শতকরা প্রায় ৭ ভাগ পর্যন্ত। মজার ব্যাপার হল তিমির দুধে চর্বি থাকে গরুর দুধের প্রায় ১২ গুণ এবং আমিষ প্রায় ৪ গুণ। শীতল পানির মধ্যে শরীরে উত্তাপ বজায় রাখতে এবং মেরু অঞ্চল থেকে উষ্ণতর অঞ্চলে পাড়ি দেবার শক্তি যোগাতে এই অতিরিক্ত চর্বি তিমির বাচ্চার অতি প্রয়োজন। নবজাত মানবশিশুর আদর্শ খাদ্য তার মায়ের দুধ, গরুর দুধ নয়। তাই মায়ের দুধের বদলে গরুর দুধ খাওয়ানোর অর্থ হল শিশুকে এই আদর্শ খাদ্য থেকে বঞ্চিত করা।

দুধ টকে যায়, স্ট্রেপটোকক্কাস ল্যাকটিস নামে এক ধরনের জীবাণুর ক্রিয়ার ফলে। আরো কিছু জীবাণুও অবশ্য এর জন্য দায়ী হতে পারে। এ সব জীবাণু এমন সব এনজাইম উৎপন্ন করে যা দুধের চিনি ল্যাকটোজকে ল্যাকটিক এসিডে পরিণত করে। অম্লতার এই বৃদ্ধি দুধের আমিষকে থিতিয়ে দেয়, এবং তা ঘন হয়ে দৈয়ের মতো বসে যায়। দুধকে উচ্চ তাপমাত্রায় নিয়ে পরে আবার ঠাণ্ডা করে পাস্তুরায়ণ পদ্ধতিতে জীবাণু ধ্বংস করে টকে যাওয়া রোধ করা যায়।

অনেক সময় আমরা ইচ্ছে করে বিশেষ জীবাণুর ব্যবহার করে দুধ থেকে অন্যান্য খাদ্য তৈরি করি। যেমন স্ট্রেপটোককাস থার্মোফাইলাস এবং ল্যাকটো ব্যাসিলাস বুলগারিসাস নামক জীবাণু ব্যবহৃত হয় দই তৈরি করতে এবং আরো কিছু জীবাণু ব্যবহৃত হয় পনির তৈরি করতে। দই বা পনিরের গাঁজন দেবার সময় এই জীবাণু মিশিয়ে দেওয়া হয়।

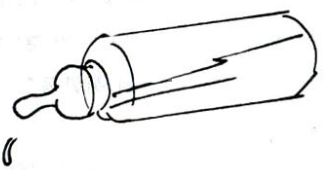
দুধের প্রধান চর্বিগুলো ট্রাইগ্লিসারাইড ধরনের। এ ছাড়া দুধে থাকে কিছু পরিমাণে লিপিড, লেসিথিন এবং কোলেস্টোরল। দুধের লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম ও পটাশিয়ামের ক্লোরাইড ও ফসফেট লবণগুলোই প্রধান। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস প্রয়োজন হাড় ও দাঁতের গঠনের জন্য।

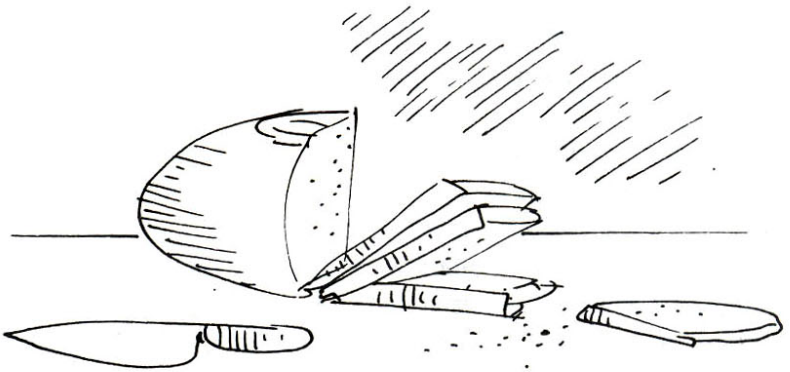
দুধে প্রায় সব রকম ভিটামিন থাকলেও এর মধ্যে ভিটামিন সিও ডি-এর পরিমাণ খুবই সামান্য। তাই টিনজাত শিশুখাদ্য গুড়ো দুধে অনেক সময় এ সব ভিটামিন কিছু বাড়তি মিশিয়ে নেওয়া হয়। মানুষের দুধে অবশ্য ভিটামিন সি' এর পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক।

গরুর স্তনে রয়েছে রক্ত নালির মাধ্যমে অতিরিক্ত রক্ত সরবরাহের ব্যবস্থা। এই রক্তই সেখানে নিয়ে যায় দুধ সৃষ্টির উপাদানগুলো। অবশ্যই রক্তে রয়েছে চিনি, চর্বি আমিষ, ভিটামিন সব রকমের খাদ্য উপাদান। কিন্তু রক্তের এই উপাদানগুলো সংগৃহীত হলেই দুধে পরিণত হতে পারে না। যেমন রক্তে যে চিনি রয়েছে সেটি গ্লুকোজ, কিন্তু দুধের চিনি ল্যাকটোজ। কাজেই স্পষ্টত স্তনের মধ্যে দুধ সৃষ্টির সময় রাসায়নিক পরিবর্তনে এই গ্লুকোজ ল্যাকটোজে পরিণত হয়। এই যে পরিবর্তন এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল একটি প্রক্রিয়া যার সবটুকু এখনো ভাল করে বোঝাই হয়ে উঠেনি।

গরুর দুধের গুণ খনিকটা গরুর খাদ্যের উপর নির্ভর করে, কিন্তু পুরোপুরি নয়। গরুর খাদ্যে ঘাটতি পড়লে দুধের পরিমাণ অনেক কমে যাবে বটে কিন্তু দুধের গুণ ততটা নয়। এর কারণ গরু নিজের শরীরে সঞ্চিত উপাদান দিয়ে দুধের গুণকে ঠিক রাখে। উদাহরণস্বরূপ, দুগ্ধবতী গাইয়ের খাদ্যে ক্যালসিয়ামের অভাব ঘটলে তার হাঁড় থেকে ক্যালসিয়াম দুধ তৈরির কাজে চলে যেতে থাকে এবং হাঁড়ে অসুখ দেখা দেয়। অবশ্য দুধে ননীর পরিমাণ অনেকটা গাভীর খাদ্যের উপর নির্ভর করে। শুধু কচি ঘাস আর ঘন খাদ্য খাওয়ালে অথচ খড় ইত্যাদি না থাকলে দুধে ননীর অভাব ঘটে। এর কারণ তখন চর্বি সংগঠনের জীবাণুঘটিত কাজগুলোর ব্যাঘাত ঘটে।

শিশু খাদ্য ও সাধারণ পুষ্টিকর পানীয় হিসেবে দুধের গঠন-এর উৎপাদন সম্পর্কে গবেষণার গুরুত্ব অনেক। এর যথাযথ উন্নয়ন একদিন পৃথিবীকে খাদ্য সমস্যার হাত থেকে সত্যি মুক্তি দিতে পারে।





পনির

প্রায় চার হাজার বছর আগের কথা। মধ্য এশিয়ায় যাযাবর জাতিরা তখন ধু-ধু তৃণভূমিতে ঘোড়া চালিয়ে বেড়ায়। ঘোড়া, উট, গরু এ সবের দুধ তাদের খাদ্যের একটি প্রধান অংশ। কিন্তু দুধ সব সময় যথেষ্ট পাওয়া যায় না। যখন পাওয়া যায় তখন কিছু জমিয়ে রাখলে চলে। দুধকে টকিয়ে রেখে জমা রাখার চেষ্টা তারা করেছে। কিন্তু তাও বেশি দিন থাকে না। এমনি জমিয়ে রাখার তাগিদে তারা ধীরে ধীরে উদ্ভাবন করলো এক কৌশল। গরুর বা ভেড়ার পাকস্থলীর রস মিশিয়ে দিলে টকে যাওয়া দুধ থেকে তৈরি হতে পারে বেশ ঘন শক্ত একটি নতুন খাদ্য; খেতে বেশ অন্য স্বাদ, ভালই লাগে। আবার রেখেও দেয়া যায় অনেক দিন। এভাবেই সেই প্রাচীনকালে মানুষ বানাতে শিখেছিল পনির। সেই থেকে পনির দুনিয়ার দেশে দেশে খাদ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

কি রকম উষ্ণতায়, কি আর্দ্রতায় কতদিন ধরে পনিরকে জমতে দেওয়া হল তার উপরেই পনিরের রকমফের অনেকখানি নির্ভর করে। কোন কোন পনির অল্প কয়েকদিনেই মজে। আবার কোন কোনটিকে এক বছরও রেখে দেওয়া হতে পারে মজাবার ঘরে, সযত্নে। যত বেশিদিন মজবে পনিরের স্বাদ-গন্ধ তত তীব্র প্রকৃতির হবে। এর শুরুতে শুকাবার সময় পনিরের বাইরের ত্বকে একটি শক্ত চামড়ার মত সৃষ্টি হয়। এটি ভেতরের পনিরের জন্য একটি আবরণের কাজ করে। কখনো আবার চামড়া সৃষ্টি হতে না দিয়ে গোড়াতেই পনিরকে একটি প্লাস্টিকের আবরণে ঢেকে দেয়া হয়।

প্রায় চারশ' রকম পনিরের সবকটাকে তা কি রকম নরম বা শক্ত সেই বিবেচনায় কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। একেবারে নরম পনিরের দলে আছে কটেজ চীজ এবং ক্রিম চীজ। আর এক দল হল সামান্য-শক্ত পনির। এগুলোর কোন কোনটিতে এক

ধরনের ছত্রাক মেশানো হয়ে থাকে ইচ্ছে করেই-যা একে বিশেষ ধরনের স্বাদ দিয়ে থাকে। বিখ্যাত চেডার চীজ এবং সুইস চীজ আবার অন্য একটি দলভুক্ত—যা শক্ত পনির। এগুলোতে সাধারণত প্রচুর ছিদ্র থাকে। তৈরির সময় জীবাণুর ক্রিয়ায় কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস তৈরি হয়ে এসব ছিদ্র দেখা দেয়। সুইস চীজে গ্যাসের বুদবুদগুলো এত বড় হয় যে এর সারা গায়ে বেশ বড় বড় গর্ত দেখা যায়। খুব শক্ত আর একদল পনির রয়েছে যাদেরকে এমনিতে খাওয়া যায় না। গুড়ো করে তা নানা খাদ্যে ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

পনিরের স্বাদ অনেকটা স্থানীয় এবং ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার। এক রকম পনিরের স্বাদ-গন্ধ যার প্রিয় অন্যরকম পনির তার কাছে খুব পছন্দ নাও হতে পারে। ছোট এক একটি এলাকার পনির আবার অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ব-জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে তার স্বাদ-গন্ধের জন্য। দুগ্ধজাত খাদ্যের মধ্যে যে পরিমাণ বৈচিত্র্য ও রসনাশিল্প পনির এনে দিয়েছে, তার সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা হয় না।

আমাদের দেশে অবশ্য পনিরের চলন খুব বেশি নয়। যে পনির আমাদের রয়েছে তাও সবই প্রায় একই রকমের, কোন বৈচিত্র্য নেই। আসলে দুগ্ধজাত খাদ্য জমিয়ে রাখার তাগিদ বোধ হয় আমরা তেমন অনুভব করিনি, তাই বিচিত্র রকমের পনির তৈরির এবং তার স্বাদ গ্রহণ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। আসলে সারা দুনিয়ায় শত রকমের পনির রয়েছে যেগুলো দেখতে, ছুঁতে এবং স্বাদে-গন্ধে বিচিত্র, একটি অন্যটির চেয়ে যথেষ্ট আলাদা।

পনিরের মধ্যে দুধের প্রধান খাদ্য উপাদানগুলো সবই বজায় থাকে, আর তা থাকে অনেক বেশি ঘন অবস্থায়। এক টুকরা পনির থেকে তার ছয়গুণ ওজনের দুধের সমান পুষ্টি পাওয়া যায়। দুনিয়ার সর্বত্র গরুর দুধের পনিরই বেশি প্রচলিত। কিন্তু কোন কোন জায়গায় ছাগল, মহিষ আর ভেড়ার দুধের পনির বেশ জনপ্রিয়। ফ্রান্সে ছাগলের দুধের পনিরের একটি আলাদা কদর রয়েছে এর তীব্র ঝাঁঝালো স্বাদের জন্য। স্থানীয়ভাবে পাওয়া ভিন্ন কিছু পশুর পনিরও অনেকে তৈরি করে। যেমন ল্যাপল্যান্ডে বল্গা হরিণের দুধ থেকে এবং তিব্বতে ইয়াক বা চমরী গাইয়ের দুধ থেকে যে পনির তৈরি হয় তা এ দুটি অঞ্চলের লোকের একটি প্রধান খাদ্য।

রকমফের অনুসারে পনির তৈরির কায়দাতেও নানা পার্থক্য রয়েছে। তবে কয়েকটি মূল ব্যাপার সবখানে একই। দুধ থেকে পনির তৈরি আসলে বিশেষ ধরনের জীবাণু আর এনজাইমের কারসাজির ফল। দুধকে গরম করে তাতে বিশেষ ধরনের জীবাণু পূর্ণ বীজ দিলে দুধ টকে ফেটে যায়। এটি অনেকটা দৈ তৈরির মত। কিছু সময় পর এতে মেশানো হয় রেনেট নামে একটি এনজাইমঘটিত বস্তু যা গরু বাছুরের পাকস্থলীর দেয়াল থেকে সংগ্রহ করা হয়। এ সময় আরো অন্যান্য এনজাইমও মেশানো হতে পারে পনিরকে বিশেষ স্বাদ-গন্ধ দেবার জন্য। এ সবের কাজের ফলে টকে যাওয়া দুধের জলীয় অংশ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে ফেলার পালা। জলীয় অংশ পুরো আলাদা করে ফেলার পর কঠিন অংশকে মজতে দেয়া হয় বিশেষ অবস্থায় রেখে। এ সময় এর সঙ্গে নানা পরিমাণ লবণও মেশানো হতে পারে।



চা স্পৃহা চঞ্চল

'দুনিয়ার কোলাহল ভুলে থাকার জন্যই চা খাওয়া'—বহুদিন আগে চীনের সাধক তিয়েন ইহেং এর লেখা বাণী। চীন দুনিয়াকে অনেক কিছু দিয়েছে। চা-টাও দুনিয়ার প্রতি চীনেরই দান। আজ এর আবেদন বিশ্বজনীন। ইউরোপে বলা হয় ওয়াইনটা আলাপের জন্য, হুইস্কিটা উত্তেজনার জন্য, কফিটা মধ্যরাত্রির বিদ্যাভ্যাসের জন্য, আর চা? সেটা সুন্দর প্রশান্তির জন্য, নিজের সাথে স্বাভাবিকতা অর্জনের জন্য। অবশ্য তুফানওতো মানুষ চায়ের পেয়ালাতেই তোলে।

চা পান বিশ্বজনীন অভ্যাস হলেও তার কায়দা-কানুন এক এক দেশে এক এক রকম। ট্রান্সসাইবেরিয়ান রেলওয়ে যোগে যখন মস্কো থেকে ভ্লাদিভোস্টক আসবেন তখন আপনার চা তৈরি হবে সামোভারে, আপনার সামনেই। সামোভার রাশিয়ার নিজস্ব অবদান। ভারতীয় রেলওয়েতে কলকাতা থেকে দিল্লী যেতে মাটির খুপরিতে করে চা খাওয়াটাও বেশ নিজস্ব কায়দা—একেবারে ডিসপোজেবল কাপ। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা চা খায় বড় বড় কালো টিনের মধ্য থেকে। আর পেশোয়ারে কিচ্ছাখানির বাজারে, পাঠানের চা খাওয়া—ছোট্ট কাপে একের পর এক অসংখ্য কাপ। জাপানে চা বানানো আর চা পরিবেশন সবই একটি শিল্পকর্ম হয়ে যেতে পারে—ওখানকার চা অনুষ্ঠান ব্যাপারটাই অন্য রকম। কেনিয়াতে মেহমানকে অভ্যর্থনা জানানো হয় 'কারিবু চাই' এই বলে। এর মানে 'স্বাগতম, একটু চা খাওয়া যাক।' ইংল্যান্ডে শ্রমিকদের সকালে—বিকালে চা পানের জন্য খানিকটা সময় ছুটি একেবারেই অনড় অধিকার। এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল বলে একবার তীব্র শ্রমিক ধর্মঘট দেখা দিয়েছিল। ইস্তাম্বুলের চা-ওয়ালার কাছে কাঁচের গ্লাসে চা দেখায় ভারি সুন্দর।

বন্য ক্যামেলিয়া গোত্রের একটি বিশেষ রূপ ক্যামেলিয়া সিনেসিস আমাদের চায়ের উৎস সেই চা গাছটি। চির হরিৎ এই গাছটি বন্য অবস্থায় ৩০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হলেও, চায়ের বাগানে একে ছেঁটে তিন চার ফুটের মধ্যে রাখা হয়। সামান্য অম্ল মাটি, পাহাড়ী ঢাল যেখানে পানি জমতে পারে না অথচ বৃষ্টি যেখানে যথেষ্ট—অন্তত বছরে ৫০ ইঞ্চি, সেখানেই চা বাগান হতে পারে। ভারত, চীন, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, আফ্রিকা—এই-ই চা উৎপাদনের প্রধান কয়টি কেন্দ্র। আফ্রিকা এর মধ্যে নবাগত।

চায়ের দুটি প্রধান উপাদান হল ক্যাফেইন এবং টেনিন। ঠিকমতো শুকানো তৈরি চায়ে থিওব্রোমিন ও থিওফিলাইন নামে আরো দুটো উপাদান এর সাথে মিশে। এরা হৃৎপিণ্ড এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে খানিকটা চাঙ্গা করে তোলে আর পেটের অম্লতা কমাতে সাহায্য করে। তা ছাড়া চায়ের মধ্যে সামান্য পরিমাণে কিছু দরকারি ফ্লোরাইড, কিছু তেল এবং 'বি' ভিটামিনও রয়েছে।

অতীতে চা পানের নানান রকম উপকারিতার কথা দাবি করা হতো। তাই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন একবার বলেছিলেন 'ঠাণ্ডায় চা তোমাকে গরম করে তুলবে, মন খারাপ থাকলে চা তোমাকে চাঙ্গা করে তুলবে আর বেশি উত্তেজিত থাকলে এটা তোমাকে শান্ত করবে।' আজও অনেক চায়ের এমনি অবাক পরস্পর বিরোধী গুণের কথা স্বীকার করেন। অবশ্য চায়ের বিরুদ্ধপক্ষও ছিল, এখনো আছে। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের মতো বিজ্ঞানী চায়ের বিরুদ্ধে রীতিমত প্রচার চালিয়েছিলেন—"৫ কোটি বাঙালি এবং ৩২ কোটি ভারতবাসীকে বিদেশী অর্থপিশাচ স্বার্থান্ধ বণিক কি মোহন মন্ত্রেই না বশীভূত করিয়া চা পান অথবা বিষপান করাইতেছেন এবং বাঙালি ও ভারতবাসী সুধাভ্রমে গরল পান করিয়া কিরূপেই না ধনে প্রাণে উৎসন্ন যাইতেছেন।" তিনি অবশ্য চা-কে ঔপনিবেশিক আর্থিক শোষণের হাতিয়ার হিসেবে দেখেছিলেন। আবার ও সময়েই রবীন্দ্রনাথের কেতলী জল জল, চা স্পৃহা চঞ্চল ... কবিতাটিতে চায়ের প্রতি টান আর ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে।

প্রায় দু'হাজার বছর আগে চীনে প্রথম চায়ের চাষ হয়েছিল বলে মনে করা হয়। তারপর প্রথম এটা আসে জাপানে ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দে। ইউরোপে চা আসে ১৬১০ সালে ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মারফত। ভারতীয় উপমহাদেশে চায়ের চাষ ইংরেজদের আমলেই শুরু হয়।

উদ্ভিদবিদ্যার দিক থেকে চায়ের ছয়টি বিভিন্ন জাত রয়েছে। কিন্তু চা রসিকের কাছে এর অসংখ্য জাত। বলা যেতে পারে যত বাগান, যত মরশুম বা মাটি, তত রকমের চা—আবার এদের নানা মিশেল ঘটিয়ে পাওয়া যায় আরো রকমফের। অনেক জায়গায় চা কে জেসমিন ফুলের গন্ধযুক্ত করে নেয়া হয় এই ফুলের সান্নিধ্যে রেখে। বিভিন্ন পরিচিত ব্র্যান্ডগুলো তৈরি হয় উপযুক্ত নানা রকম চা-এর সঠিক মিশ্রণে। যারা চায়ের স্বাদ-গন্ধ নিয়ে এর শ্রেণীবিভাগ ও মূল্যায়ন করেন তাঁরা খুব অভিজ্ঞ লোক। তাঁরা ঠিক বলে দিতে পারেন কোন চা কোন বাগানের, কোন মৌসুমে তা তোলা হয়েছে ইত্যাদি।

দুটি পাতা একটি কুড়ি—চা তোলার এই-ই নিয়ম। বছরের কয়েকটি মৌসুমে ক্ষিপ্র হাতে আগার দুটি পাতা ও মাঝখানের কুড়িটা তুলে নেয় কর্মী মেয়েরা। দিনে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ সের পর্যন্ত চা পাতা তারা এভাবে তুলতে পারে। তারপর শুকিয়ে, একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে চা বাজারের জন্য বাক্সবন্দী হয়।

বাংলাদেশ চা রফতানি করা দেশগুলোর একটি। আমাদের চা বাগানগুলো বেশির ভাগ সিলেটে। সেখানে শ্রীমঙ্গলে রয়েছে—বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট। আমাদের চা দুনিয়ার চা রসিকদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে চাইলে আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। এই সুপ্রাচীন পানীয়টির প্রতি আমাদের সম্পর্ক সব দিক থেকে, তাই এর প্রতি আমাদের দায়িত্বও যথেষ্ট।





চায়ের কাপে তুফান

ড্রাগের নেশা নিয়ে যখন দুনিয়ার সকল প্রদত্ত মানুষ উদ্বিগ্ন সে সময় একটি নেশা কিন্তু আমরা সবাই মিলে করে যাচ্ছি—সেটি হল ক্যাফেইনের। কফি, চা, কোলা পানীয়, চকোলেট ইত্যাদিরূপে সারা দুনিয়ার মানুষ প্রায় নিয়মিতভাবেই ক্যাফেইন সেবন করছি। অথচ অনেকের মতে এটিও একটি নেশার ড্রাগ যার নানা প্রতিক্রিয়া রয়েছে। বিষয়টি বিতর্কিত তবে একই সঙ্গে এটি নিয়ে গবেষণারও অন্ত নেই।

প্রশ্নটি হল এটি কি নেশা, না এটি নেশা নয়। উভয়পক্ষে বক্তব্য আসছে গবেষণার ফলাফল থেকে। সম্প্রতি ফরাসি জাতীয় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা গবেষণা ইনস্টিটিউট জানিয়েছে যে পরীক্ষাগারে ইঁদুরকে পরিমিত পরিমাণ ক্যাফেইন দিয়ে দেখা গেছে যে এটি মস্তিষ্কের নিউক্লিয়াস একুম্বন অঞ্চলের সক্রিয়তা বাড়ায় না। অথচ মনে করা হয় যে নেশার আসক্তির একটি প্রধান অনুষঙ্গ হল এখানকার সক্রিয়তা বৃদ্ধি। কোকেন, এমফেটামিন, নিকোটিন, মরফিন ইত্যাদি সব রকম ড্রাগের সামান্যতম রেশও মস্তিষ্কের এই অঞ্চলকে উত্তেজিত করে। কিন্তু নেশার অন্যান্য সব অনুষঙ্গও রয়েছে, যেগুলোর দিকে তাকানো প্রয়োজন।

ক্যাফেইনের সঙ্গে অন্যান্য ড্রাগের একটি দিকে মিল রয়েছে। এরা সবাই শরীরে ডোপামিন মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। যেমন ক্যাফেইন আমাদেরকে কিছুটা জাগ্রত ও সচেতন অনুভব করায় তার কারণ এটি আডেনোসিন নামে মস্তিষ্কের একটি রাসায়নিক দ্রব্যের গ্রহণ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। মস্তিষ্কের স্নায়ু-পরিবহনকে মন্থর করে দেয়ার ব্যাপারে আডোনোসিনের ভূমিকা রয়েছে। একে বন্ধ করার সঙ্গে মস্তিষ্কের অনুভূতি চাঙ্গা করার আর ডোপামিন মাত্রা বাড়ানোর যোগসূত্র রয়েছে। এদিক থেকে ক্যাফেইনের এমন কিছু অনুভূতি সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে যা নেশার ড্রাগগুলোরও রয়েছে।

তবে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন ক্যাফেইনের দ্বারা ডোপামিন বৃদ্ধিতে একটি সুখপ্রদ ভাব সৃষ্টি করতে পারে বটে, তবে তাকে সুনির্দিষ্টভাবে নেশা বলা যায় না। ক্যাফেইনের এবং ড্রাগের কাজের পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আর একদল বিজ্ঞানী মনে করেন ক্যাফেইনের সঙ্গে নেশার সম্পর্কটি উড়িয়ে দেবার মত নয়। অন্যান্য ড্রাগের মতই এর একটি আসক্তি জন্মে এবং সেগুলোর মতই হঠাৎ করে এর অভ্যাস ছেড়ে দেবার চেষ্টা করলে প্রত্যাহারজনিত সমস্যা দেখা দেয়। এ সম্পর্কে সাম্প্রতিক একটি পরীক্ষা বেশ মজার। কয়েকজন স্বেচ্ছসেবীকে একদিন কিছু ক্যাপসুল খেতে দেয়া হয়েছে যার মধ্যে ক্যাফেইন ছিল। ক্যাপসুলগুলোর মধ্যে কেউ পেয়েছে লাল রঙের, কেউ নীল রঙের। পরের দিন ক্যাপসুলে কোন কিছুই ছিল না-তাও ঐ লাল ও নীল রঙের। তৃতীয় দিন ঐ দুই রঙের ক্যাপসুল দিয়ে স্বেচ্ছাসেবীদের তার থেকে যে-কোন একটি বেছে নিতে বলা হয়েছে। যদিও তাদের কখন কোনটার মধ্যে কি ছিল কখনো বলা হয়নি, শুধু বলা হয়েছে যে এতে সাধারণ খাদ্য দ্রব্যের পুষ্টি উপাদান আছে-তবুও বাছাই করার সময় শতকরা ৮০ জন সেই রং বেছে নিয়েছে যে রঙের ক্যাপসুলে তার ক্যাফেইন ছিল। এর থেকে স্পষ্ট যে ক্যাফেইনের আসক্তি শরীর বুঝতে পারে এবং তারই চাহিদা সৃষ্টি হয়। পরে ওটি না পেলে এক ধরনের হতাশাও জন্মে। এগুলো নেশার লক্ষণ।

এটি অবশ্য ভোরে যারা চা বা কফির প্রত্যাশা করেন তদের নতুন করে বলার কোন অপেক্ষা রাখে না। একদিন যদি চা পান না করেই সকালে কাজে বের হয়ে যেতে হয় অভাবটি যে কিভাবে কাজকর্মে প্রভাব ফেলে সেটি কে না লক্ষ্য করেছে। ক্যাফেইনে অভ্যস্ত মানুষকে এটি ছাড়া চলতে হলে উপসর্গ যেগুলো দেখা দেয় তা নেহাৎ তুচ্ছ করার মত নয়।

এ ধরনের প্রত্যাহার উপসর্গ দেখা দেবার জন্য যে জবরদস্ত রকম কফি-খোর বা চা-খোর হতে হবে এমন কোন কথা নেই। দৈনিক ১০০ মিলিগ্রাম ক্যাফেইনে অভ্যস্ত এমন মানুষের জন্যও উপসর্গগুলো স্পষ্ট হতে পারে। এটুকু ক্যাফেইন মাত্র দুই কাপ চায়ে অথবা এক কাপ সাধারণ ইনস্ট্যান্ট কফিতেই পাওয়া যায়। প্রত্যাহার উপসর্গের মধ্যে থাকে মাথা ধরা, অবসাদ, মনোযোগের অভাব, ঝিমানো ভাব। ক্যাফেইন বর্জিত দুই একদিন কাটানোর পর উপসর্গগুলো চরমে উঠে এবং এভাবে এক সপ্তাহরও বেশি চলতে পারে। অবশ্য দেখা গেছে যে আগে নিয়মিতভাবে যেটুকু ক্যাফেইনের অভ্যাস ছিল তার চেয়ে অনেক কম মাত্রায় এটি গ্রহণ করলেও উপসর্গের ভাবগুলো হ্রাস পায়। যেমন কেউ যদি দৈনিক তিন কাপ কফিতে অভ্যস্ত হয় (৩০০মিলিগ্রাম ক্যাফেইন), তা হলে মাত্র ২৫ মিলিগ্রামে নেমে গিয়েও প্রত্যাহার উপসর্গকে প্রতিকার করা যায়। যেমন সকালের-দুপুরের কফি কারো বাদ পড়লো। তিনিই যদি একটি কোলা জাতীয় পানীয় পান করেন তাতেই তাঁর অভাবজনিত ভাবটি অনেকটা কেটে যাবে। অথচ এক বোতল এই পানীয়ের মধ্যে রয়েছে মাত্র ৩০ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন।

মানুষের শরীর তার অভ্যস্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণ ক্যাফেইন স্বাভাবিক ক্ষেত্রে খুঁজে নিতে চায় যদি সেটা পাওয়া যায়। কেউ যদি গাঢ় চায়ের এক কাপে অভ্যস্ত হন তবে

পাতলা চা দিলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই দু'কাপ খাবেন। অন্যান্য নানা নেশার মত ক্যাফেইনেরও একটি সহনশীলতার ব্যাপার আছে। যে বেশি কফি খেতে অভ্যস্ত নয় তাকে একদিন ৪০০ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন খাওয়ালে (৪ কাপ) নিশ্চিত ঘুমের সমস্যা হবে। কিন্তু এমনিভাবে যদি এক সপ্তাহ চলতে থাকে তখন সমস্যাগুলো আর থাকে না—শরীর উচ্চ ক্যাফেইনে সয়ে যায়।

ক্যাফেইনের একটি জৈব রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া হল ক্যাটেকোলামাইন বৃদ্ধি। এটি হল এমন একটি স্নায়ু-পরিবাহক যা 'হয় লড়ো নয় পালাও' এ ধরনের সাড়া সৃষ্টিকারী। এর বৃদ্ধি ঘটলে উত্তেজনা অনুভূত হয়, পিটপিল চোখের বিস্ফারিত হয়, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুততর হয়, পেশীগুলো এ্যাকশনের জন্য তৈরি হয়ে যায়। সবাই অবশ্য ঠিক একইভাবে সাড়া দেয় না তাদের গড়নের কারণে—কিন্তু মোদ্দা ব্যাপারটি এরকমই।

ক্যাফেইন কতক্ষণ কার্যকর থাকবে তা নির্ভর করবে এর প্রভাবের অর্ধ-আয়ুর উপর। যতক্ষণে প্রভাব মূল পরিমাণের অর্ধেকে নেমে আসে, সেটিই অর্ধ-স্নায়ু। এটি সাধারণত চার ঘণ্টা, তবে জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল নিচ্ছে এমন মহিলাদের ক্ষেত্রে দীর্ঘতর, প্রায় দ্বিগুণ সময়। কিন্তু নিয়মিত ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে এটি অর্ধেক-মাত্র ২ ঘণ্টা। অর্থাৎ ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে চা-কফির প্রয়োজনীয়তা আবার দেখা দেয় অনেক তাড়াতাড়ি। ধূমপান আর কফি পানের প্রবণতা মানুষের একই সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। এটি বেশি লক্ষ্য করা যায় যখন কেউ ধূমপান ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু চা কফি পানের পরিমাণ আগের মতই রেখে দিয়েছে তখন। তখন তাদের মধ্যে উচ্চ ক্যাফেইনের উপসর্গগুলো দেখা দেয়-অনিদ্রা, অস্থিরতা ইত্যাদি। ধূমপান ছাড়ার প্রচেষ্টার এটি একটি বিঘ্ন হিসেবে আসতে পারে—যদি না ক্যাফেইনও একই সঙ্গে কমিয়ে আনা হয়।

এবার আসা যাক সেই আসল প্রশ্নে চা কফি পান আদৌ ক্ষতিকর কিনা। এ সম্পর্কিত বিতর্ক অন্তত কয়েকশত বছর পুরানো। ইংল্যান্ডে যখন প্রথম চা জনপ্রিয় হচ্ছে তখন ১৬৭৪ সালে লন্ডনের মহিলারা পুরুষত্বহীনতার জন্য অতিরিক্ত 'চা পানকে দায়ী করেছে। এ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় চা পান আর জাতির সর্বনাশ' এই মর্মে একটি রীতিমত আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। আর এই সেদিন ১৯৭০-এর দশকেও বিজ্ঞানীরা কফি পানের সঙ্গে হার্টের অসুখ, প্যানক্রিয়াসের ক্যানসার এবং প্রজননতন্ত্রের নানা অসুখের সম্পর্কের অভিযোগ করেছেন আজ অবধি যা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

তবে কিছু কিছু ঝুঁকির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ক্যাফেইন গ্রহণ একটি কারণ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এটি রক্তচাপ বাড়ায় এবং সেই কারণে পরবর্তীতে হার্টের অসুখের কারণ ঘটাতে পারে। প্রতিদিন চার পাঁচ কাপ কফি খেলে রক্তচাপ পাঁচ ঘর বৃদ্ধি পেতে পারে এমন প্রমাণ রয়েছে। তা ছাড়া ক্যাফেইন মানসিক চাপ বাড়ায়। যে সব কাজে মানসিক চাপে থাকতে হয় সেখানে ঘন ঘন চা কফি খাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে এমন প্রমাণ রয়েছে। সেটিই আবার চাপকে আরো তীব্র করে তুলতে পারে। এসব প্রভাবের পরিমাণ সম্পর্কে অবশ্য যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে কারণ গবেষণার মধ্যে জটিলতা প্রচুর। যেমন, চা-কফির মধ্যে ক্যাফেইন ছাড়াও নানা দ্রব্য থাকে যাদের কোন কোনটি

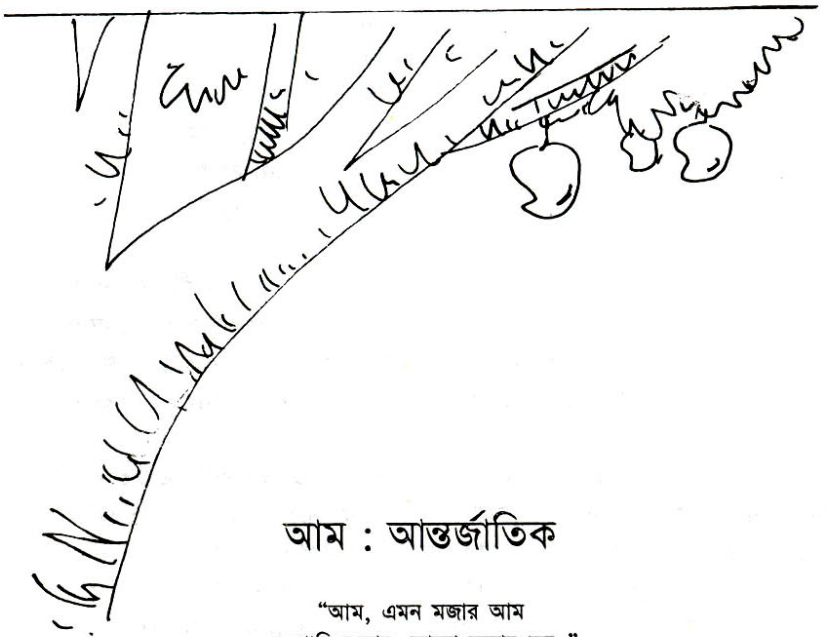
ক্যাফেইনের বিপরীত রকম কাজ করে। কফি বা চা এর সবকিছুকে প্রমিত করাটাও দুরূহ। কারণ এক এক ধরনের ব্র্যান্ডে, প্রস্তুতির প্রক্রিয়ায়, এগুলো ভিন্ন হয়। তাই বিজ্ঞানীরা এখন চা-কফি খাওয়ার পরিমাণ বা প্রকারের দিকে না তাকিয়ে বরং রক্তে ক্যাফেইনের সৃষ্ট উৎপাদ্য প্যারাজানথাইনের পরিমাণ মাপছেন। এভাবে তাঁরা দেখিয়েছেন যে গর্ভাবস্থায় কফি খেলে গর্ভপাত হবার সম্ভাবনা বাড়ে—একথা শুধু অতি উচ্চ প্যারাজানথাইনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দৈনিক পাঁচ কাপের উপর কফি খেলেই এমনটি হতে পারে।

তবে গর্ভাবস্থায় এবং দুধ খাওয়াবার কালে মা-দের চা-কফি সীমিত রাখা ভাল; কারণ ক্যাফেইন প্লাসেন্টার বাধা অতিক্রম করে রক্তের সঙ্গে গর্ভের সন্তানের মধ্যে যায়, মায়ের দুধেও যায়। তা ছাড়া গর্ভবতীর দেহে ক্যাফেইনে অর্ধায়ুও প্রায় দ্বিগুণ। এভাবে সন্তান যেটুকু ক্যাফেইন পায় তাতেই মায়ের গর্ভে তার হৃদ-স্পন্দনের গতি বেড়ে যেতে পারে।

ক্যাফেইনের পরিমাণ যাঁরা সীমিত রাখতে চান তাঁদের জানা উচিত ক্যাফেইন কিসে বেশি কিসে কম থাকে। ডিক্যাফিনেটেড কফিতে (এক কাপে ৫ মিলিগ্রাম), কালো চকলেটে (৩০ গ্রামে ৫ মিলিগ্রাম) এর পরিমাণ খুবই সামান্য। তবে এই কফিই যখন মেশিনে পরিশ্রুত করে কড়া কফির আকারে আসে তাতে অত্যধিক ক্যাফেইন থাকতে পারে (বড় কাপে ৪০০ মিলিগ্রাম)। সাধারণ সাদা মিল্ক চকলেটেও এর পরিমাণ বেড়ে ১৫ মিলিগ্রামের মত দাঁড়ায় (৩০ গ্রামে)। ইনস্ট্যান্ট কফিতে অবশ্য ক্যাফেইন অপেক্ষাকৃত কম (এক কাপে ১০০ মিলিগ্রাম)। টি ব্যাগে বানানো চায়ে এর পরিমাণ অর্ধেক (কাপে ৫০ মিলিগ্রাম) কোলা পানীয়ের ৩৫০ মিলিমিটার বোতলে ক্যাফেইনের পরিমাণ ২৫ মিলিগ্রামের মত।

সাধারণভাবে বিজ্ঞানীরা চায়ের কাপে তুফান তোলার পক্ষপাতী নন। তাঁরা মনে করেন, বাড়াবাড়ি রকমের আসক্ত না হলে এর ক্ষতিকর দিক এমন প্রকট নয় যে ধূমপানের মত এর বিরুদ্ধে নামতে হবে। যেমন ধূমপানের ক্ষতিগুলো স্পষ্ট বলে মানুষ সহজেই একে বর্জনের পথে গিয়েছে, সাধারণত চা-কফি-কোলা-চকলেট সে রকম কিছু নয়। তবে এতে ড্রাগের মত উপাদান রয়ে গেছে সেটি মনে রেখে, সেদিক লক্ষ্য করে চা-কফির সাথে রফা করতে হয়।





আম : আন্তর্জাতিক

"আম, এমন মজার আম
দেহখানি জুড়ায়, আরো জুড়ায় মন।"

না জ্যৈষ্ঠের আম আস্বাদনের পর কোন বঙ্গ সন্তানের তৃপ্তির কথা নয় এটা। সুদূর ওয়েস্ট ইন্ডিজের লোক-সঙ্গীতের দু'টো কলি। সেখানেও লোকে আমের জন্য ব্যাকুল। শুধু সেখানে কেন? আম আপনি যথেচ্ছ পাবেন মেক্সিকোতে, থাইল্যান্ডের শহরে গ্রামে, মালয়েশিয়ায়, ফিলিপাইনে, হাওয়াইতে এমনকি মার্কিন ভূ-খণ্ডের ফ্লোরিডাতে।

দেশে দেশে আমের যেমন কদর, তার বৈচিত্র্যও কিন্তু অবিশ্বাস্য। দু'তিন সের ওজনের বিশালদেহী আম যেমন আছে, তেমনি ছোট্ট আমও কম নেই। কোনটা সত্যি সত্যি আম আকৃতির অর্থাৎ ৫ অক্ষরের মতো, কোনটা বরং গোলগাল, কোনটা ডিমের মতো, কোনটা হৃৎপিণ্ডের আকারে। আম আমরা সবুজ দেখতেই অভ্যস্ত বেশি। কিন্তু দুনিয়াতে ফ্যাকাশে হলুদ রং থেকে শুরু করে লাল টক্‌টকে পর্যন্ত সব রঙের আম রয়েছে। আমাদেরও অবশ্য ব্যতিক্রমী সিঁদুরে আম আছে। আমের ভেতরটাও হলুদ থেকে কমলা নানা রঙের হতে পারে। আর স্বাদ? দেশের আমগুলোর মধ্যেই তো খাট্টা-মিঠার কত কিসিম। সব দেশের কথা বলতে গেলে স্বাদের গন্ধের অসংখ্য বৈচিত্র্য আমের মধ্যে দেখা যায়।

অবশ্য আমের আদি ভূমি হল ভারতবর্ষ। পরে এটা নানা দেশে ছড়িয়েছে। উদ্ভিদবিদদের কাছে আমের নামই হল 'ম্যানগিফেরা ইনডিকা'। উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগে আম যে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তার নাম 'আনাকারডিয়াচি'। আমাদের পরিচিত কাঁজু বাদামও অবশ্য এই একই পরিবারের। শুরুতে, অর্থাৎ অন্তত চার হাজার বছর আগে যে বন্য আমগাছ ভারতবর্ষে নানা জায়গায় দেখা যেত তার ফল খাওয়া যেত না।

ভারতবাসীরাই হাজার চারেক বছর ধরে খাওয়া যায় এরকম আমের গাছ সযত্নে চাষ করে আসছে আর রসজ্ঞের মতো তার ফল আস্বাদন করছে।

কথিত আছে বুদ্ধকে তাঁর জনৈক শিষ্য একটি আম্রকুঞ্জ দিয়েছিলেন তার ছায়াতে বিশ্রাম নেবার জন্য। আমের ফল, পাতা, ফুল—এই নকশাগুলো প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলায়, স্থাপত্যে বার বার এসেছে। আমের ফুলের পাঁচটি পাঁপড়ি কামদেবের পাঁচটি শরের প্রতীক। তা ছাড়া বিদ্যা ও বাগ্মিতার দেবী সরস্বতীর পূজায় আম্র ফুলের ব্যবহার ছিল বরাবর। মহাবীর আলেকজান্ডার ভারতে এসে নাকি আমের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। এমনকি যে পেটের পীড়ায় শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু ঘটে তাও নাকি অতিরিক্ত আম সেবনেরই ফলশ্রুতি।

অবশ্য আমাদের জানা মতে প্রথম বিদেশী যিনি আমের গুণকীর্তন করে গেছেন তিনি হলেন চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং। ৬২৯ থেকে ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ভারত ভ্রমণে এসে তিনি এই ফলটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে গেছেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে কবি আমীর খসরু লিখেছেন "আম হল বাগানের গর্ব, হিন্দুস্তানের সেরা ফল"। মোগল সম্রাট আকবর নাকি এক লক্ষ বৃক্ষের এক বিশাল আম্রকানন সৃষ্টির হুকুম দিয়েছিলেন। সেই যুগে এই রকম পরিকল্পিত বাগানের ধারণাটাই ব্যতিক্রমী ছিল।

ভারতবর্ষ থেকে এমন একটা লোভনীয় ফল চতুর্দিকে ছড়াবে এ আর এমনকি? এটা বীজ থেকে যেমন নানান জায়গায় নিয়ে যাওয়া গিয়েছে, তেমনি এর কলমও গেছে চারদিকে—বিশেষ করে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নানা দেশে। অষ্টাদশ শতাব্দীর জনৈক ইংরেজ পর্যটক তদানীন্তন ওলন্দাজ উপনিবেশ বাটাভিয়ায় (বর্তমানে জাকার্তা) গিয়ে সেখানকার "ফলভারে অবনত" এই গাছগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। এরও আগে স্পেনীয়রা ফিলিপাইন দখল করলে সেখানে তারা আম দেখতে পায়। পাশ্চাত্যে আম এসেছে পর্তুগীজরা সাফল্যজনকভাবে ব্রাজিলে আমের চাষ করার পর। সেটা ১৭০০ সালের দিকে। এর চল্লিশ বছর পরে ফলটা ওয়েস্ট ইন্ডিজে যায়। ফ্লোরিডায় যায় আরো অনেক পরে ১৮৩৩ সালে।

সব দেশেই আমের কয়েকটা জনপ্রিয় জাত রয়েছে। আমাদের বাংলাদেশে যেমন 'ল্যাংড়া' বা 'ফজলী' শ্রীলঙ্কায় তেমনি 'রুপী' বা 'প্যারোট ফিশ'; ওয়েস্ট ইন্ডিজে 'আমেলী', 'মিনি' বা 'জুলী'। ফিলিপিনোরা পছন্দ করে 'কারবাও' নামক এক জাতের আম। বাজারে সম্প্রতি এর নতুন নাম করা হয়েছে 'ম্যানিলা সুপার ম্যনগো'। থাইল্যান্ডের লোকেরা যেই জাতের আম পছন্দ করে তাকে তারা বলে 'ব্রাহম কাই মিয়া'—এর শাব্দিক অর্থ হল "যে ব্রাহ্মণ তার স্ত্রীকে বিক্রি করে"। প্রাচীন এক কিংবদন্তী থেকে এই নাম এসেছে এক ব্রাহ্মণ এই আম কেনার জন্য তার স্ত্রীকে পর্যন্ত বিক্রি করেছিল।

চিরাচরিতভাবে আম প্রধানত নিজ দেশেই খাওয়া হয়েছে, বড়জোর রফতানি করেছে পাশের দেশে। সঠিক সংরক্ষণ পদ্ধতির অভাব এর একটা বড় কারণ। আম রফতানির দিক থেক সবচেয়ে সচেষ্ট হয়েছে ফিলিপাইন। সেখানে এর উৎপাদন

উন্নয়নের জন্য নানা রকম গবেষণা চলছে। নতুন নতুন জাত বের করার চেষ্টা হচ্ছে। ফিলিপাইন প্রতি বছর চার হাজার টনের মতো আম রফতানি করছে—প্রধানত হংকং এ। তবে এর লক্ষ্য জাপানের আরো বড় বাজারের দিকে। ফিলিপাইনের লস বানোস কৃষি কলেজের গবেষণায় দেখা গেছে এক শতাংশ ঘন পটাশিয়াম নাইট্রেট ছিটিয়ে দিলে আমের বোল আসে তাড়াতাড়ি, আর আসে অনেক বেশি। আম যখন ভুট্টা দানার মতো ছোট্টটি থাকে তখন এর উপর এক ধরনের হর্মোন ছিটিয়ে দিলে শেষ অবধি এর ওজন অন্তত দেড়গুণ বেশি হয়। কাঁচায়, পাকায়, আচারে অম্বলে আমকে বুঝি শুধু আমরাই খেতে জানি? মোটেই না। থাইরা কাঁচা আমের ভক্ত। আমের আচার, চাটনি, পিঠা, সস, কেক, মার্মালেড, জেলী, লজেন্স, তরকারী এমনকি আইসক্রিম দুনিয়ার অনেক অনেক দেশে মানুষের রসনা তৃপ্তি করছে।





মাছ ধরার কাহিনী

জাপানের জেলেরা প্রতি বছর প্রায় এক কোটি মেট্রিক টন মাছ ধরে। কল্পনা করতে পার এটি কতখানি মাছ? নরওয়ের জেলেরা ধরে প্রায় বিশ লক্ষ টন, তাতেই নরওয়েকে দুনিয়ার মাছধরা দেশগুলোর মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। সে তুলনায় আমাদের মাছ ধরা ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। এই মাছের অধিকাংশই যে সাগর থেকে আসে তাতো বুঝতেই পারছ। সারা দুনিয়াতে যত মাছ ধরা হয় তার মোটামুটি হিসাব হল ৭ কোটি মেট্রিক টনের কিছু উপরে। তার মধ্যে জাপান একাই ধরে এক কোটি টন। কি করে সম্ভব হয় অল্প কিছু মানুষের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ মাছ সমুদ্র বক্ষ থেকে তুলে আনা?

মাছ ধরার কথা বল্লে আমাদের চোখে ভাসে ছিপ, পলো, ভেসাল জাল, ধরম জাল, খেপলা জাল ইত্যাদি জিনিস। কিন্তু সমুদ্র যারা ছেকে নিচ্ছে তারা যে জাল ব্যবহার করে সেগুলো বিশাল আকৃতির। তা ছাড়া বহু রকমের আধুনিক কৌশল তারা ব্যবহার করে। এর কোন কোনটি ব্যবহৃত হয় পানির মধ্যে মাছের ঝাঁক কোথায় আছে বোঝার জন্য; কোন কোনটি মাছ ধরা জাহাজগুলোকে নিরাপদে উত্তাল সমুদ্রের নানা জায়গায় যেতে দেবার জন্য। ছোট বড় এ রকম জাহাজগুলো তাই নানা রকম যন্ত্রপাতি ও সুযোগ-সুবিধায় পূর্ণ থাকে। 'সোনার' যন্ত্রের সাহায্যে পানির মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিশেষ রকম শব্দ তরঙ্গ। মাছের ঝাঁক থাকলে এ শব্দ প্রতিফলিত হয়ে এসে পর্দায় ছবির আকারে জানিয়ে দেয় কত বড় ঝাঁক, কত গভীরে। রেডার যন্ত্র আশেপাশের অন্যান্য জাহাজের খবর দেয়। রেডিও যোগাযোগ কোন বন্দর থেকে কত দূরে আছে সব সময় জানিয়ে রাখে।

সমুদ্রের মাছ কোথায় ধরা হয়? আসলে পুরো সমুদ্রটাই একটি বারোয়ারী জায়গা— এখানকার মাছের উপর সবার অধিকার, ধরতে পারলেই হল। দক্ষ মাছ ধরা জাতিগুলো

এর সুযোগ নিচ্ছে। সবাই অবশ্য চায় যে নিজের উপকূলের মধ্যে ক্ষেত্রগুলো নিজের দখলে থাকুক। এ নিয়ে কিছু আন্তর্জাতিক চুক্তিও সম্পন্ন হয়েছে। সত্তরের দশকে এ সম্পর্কে যে সব সম্মেলন ও চুক্তি হয়েছে তার ফলে এখন উপকূলের ৩৭০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত সমুদ্রে একক মাছ ধরার অধিকার কোন দেশ সংরক্ষিত করতে পারে। এর বাইরের সব মাছ সাধারণ সম্পত্তি।

সমুদ্রের সব জায়গায় কিছু মাছ থাকলেও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মাছ ধরার সুবিধা রয়েছে এর কিছু কিছু অঞ্চলে যেখানে গুরুত্বপূর্ণ মাছগুলোর অধিক পরিমাণে বাস করে। এগুলোকে বলা হয় মৎস্য ক্ষেত্র। অধিকাংশ মৎস্য ক্ষেত্র অবস্থিত উপকূলের কাছে মহীসোপানে—যেখানে সমুদ্রের গভীরতা অপেক্ষাকৃত খুব কম। যে সব মহীসোপানে মৌসুম বিশেষে বায়ু প্রবাহে সমুদ্রতলের পানিতে-উথাল পাথাল ঘটে সেখানকার মৎস্যক্ষেত্র ভাল হয়। এতে তলার দিকের পানির পুষ্টিদায়ক সার উপরের দিকে উঠে এসে এখানে ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলোর বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই ক্ষুদ্র জীবগুলো আবার মাছের খাবারের জন্য খুব দরকার।

সমুদ্রই অবশ্য মাছের একমাত্র উৎস নয়। কিছু কিছু দেশে অভ্যন্তরীণ নদী, হ্রদ, বিল, পুকুর ইত্যাদি থেকে মিঠা পানির মাছ ধরাটা বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এদিক থেকে অগ্রণী ভূমিকা হল চীনের। চীন প্রতি বছর ১১ লক্ষ মেট্রিক টন মিঠা পানির মাছ ধরে থাকে—যার মধ্যে রুই-কাতলা জাতীয় মাছ যেমন সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ইত্যাদি এবং তেলাপিয়া প্রধান। আমাদের দেশেও মাছ ধরার এই দিকটিই প্রাধান্য পায়।

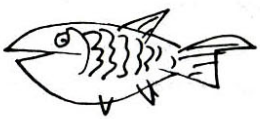
সমুদ্রের মাছ ধরা জাহাজগুলোতে সাধারণত তিন রকমের জাল ব্যবহার করা হয়—ঘের জাল, টানা জাল এবং ফুলকা জাল। ঘের জাল ২০০০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। মাছের একটি ঝাঁক আবিষ্কৃত হবার পর তাকে এই জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় এবং পরে এর তলাটাও বন্ধ করে দিয়ে মাছগুলোকে ধরে ফেলা হয়। টানা জাল জাহাজের পেছনে বাঁধা থাকে। ফানেল আকৃতির এই জালের পেছনের সরু অংশ বন্ধ থাকে আর টানার সময় মাছ সামনের হা করা বড় অংশের মধ্যে দিয়ে, এর মধ্যে আবদ্ধ হয়। এই টানা জাল বা ট্রল নেট ব্যবহার করে বলেই মাছ ধরার অনেক জাহাজকে ট্রলারও বলা হয়। ফুলকা জালগুলোর উপরে ভাসিয়ে রাখার ব্যবস্থা এবং নিচে ভারী হবার জন্য ওজন দেওয়া থাকে। সমুদ্রের যেখান দিয়ে দেশান্তরী মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে চলতে থাকে সেই চলাচল পথে এই ফুলকা জাল দেয়ালের মত পেতে দেওয়া হয়। জালের ফোকরে মাথা ঢুকিয়ে মাছ সেখানে আটকা পড়ে যায়। বেরুবার চেষ্টা করলে ফুলকাতে আরো ভালভাবে আটকিয়ে যায়, এ জন্যই এ জালের এমন নাম। বুঝতেই পারছ বিভিন্ন মাছের জন্য এ জালের ফোকর বিভিন্ন আকারের করতে হয়।

আজকাল বিরাট বিরাট কিছু মাছ ধরা জাহাজ রয়েছে যেগুলোকে বলা যায় কারখানা-জাহাজ। কারণ এরা শুধু মাছ ধরার জন্যই নয়, বরং সে মাছ কেটে কুটে, সংরক্ষিত করে এমনকি এর থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যবস্তু তৈরির কাজ পর্যন্ত ঐ জাহাজেই হয়ে যায়। এতে মাসের পর মাস ধরে সুদূর সমুদ্রে মাছ ধরায় ব্যস্ত থাকতে এ জাহাজের কোন অসুবিধা হয় না।

মাছ ধরার সঙ্গে সঙ্গে জীবাণুর ক্রিয়ায় মাছের মধ্যে পচন শুরু হবার আশংকা দেখা দেয়। তাই যত শিগগির সম্ভব মাছের প্রক্রিয়াকরণ আবশ্যক। প্রাচীন পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে শুকানো, লবণ দেয়া অথবা ধোঁয়া দেওয়া। এ সবের মাধ্যমে মাছের জলীয় ভাগ কমিয়ে ফেলা হয় বলে সহজে জীবাণু আক্রমণ হতে পারে না। এই পদ্ধতিগুলো এখনো প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় পৃথিবীর নানা দেশে। আমাদের দেশে অবশ্য শুকিয়ে শুঁটকি করাটারই কিছু চল রয়েছে। লবণ-দেয়া শুধু নোনা ইলিশেই সাধারণত সীমাবদ্ধ। মাছ সংরক্ষণের আধুনিক উপায় হল প্রধানত টিনজাতকরণ ও হিমায়ন। টিনের মধ্যে নিশ্ছিদ্রভাবে আবদ্ধ করে মাছকে উচ্চ চাপে রান্না করা হয়। ফলে এর ভেতরের সব জীবাণু মরে যায়, নতুন করে আর জীবাণু ঢুকতেও পারে না।

হিমায়ন পদ্ধতিতে মাছকে দ্রুত বরফের চেয়েও অন্তত ২৯° সেলসিয়াসের নিচের উত্তাপে নামিয়ে আনা হয় এবং তারপর থেকে না খাওয়া পর্যন্ত ঠাণ্ডার মধ্যেই রাখা হয়। কোন কোন মাছ থেকে মাছের ময়দা তৈরি করে রাখা হয়। মাছের ময়দা সাধারণত পশু পাখির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

আধুনিক এ সব পদ্ধতিতে সমৃদ্ধ হয়ে স্বল্প লোকবল নিয়েই কোন কোন দেশ সমুদ্র ছেঁকে বিপুল পরিমাণ মৎস্য সম্পদ আহরণ করছে। মাছের রফতানিতে সে সব দেশের মানুষের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি দেখা দিচ্ছে আবার তাদের পাতেও থাকছে সব সময় পুষ্টিকর সব মাছ। আমাদের সমুদ্র উপকূলে ভাল মৎস্য ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও আমরা এদিকটিতে বেশি যত্নবান হইনি, হওয়া উচিত।





সাগর সিঞ্চনে

বিশ্বে জলরাশির সম্পদকে এক সময় অফুরন্ত মনে করা হতো। আজ আর তা মনে করা হয় না। মাছকে এক সময় বলা হতো গরীবের আমিষ খাবার। আজ তা মনে করা হয় না। পৃথিবীর শক্তিধর ধনী দেশগুলো আজ সাগরের এই সম্পদকে যত পারা যায় কুড়িয়ে আনার জন্য সব উপায় অবলম্বন করছে, পরস্পর লড়ছে, এমনকি গুরুতর কূটনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি করছে। তাদের কারণে এবং তাদের জন্য মাছ-ধরার প্রযুক্তি সাম্প্রতিককালে এত উন্নত হয়েছে যে পঞ্চাশের দশকের তুলনায় বর্তমানে বিশ্বের সকল সমুদ্র থেকে তুলে আনা মাছের পরিমাণ চার গুণে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ বাংলাদেশের ধীবর খালে-বিলে-সাগরে জাল দিয়ে যখন অপেক্ষা করে তখন জালের টানে আসা মাছে ছোট্ট টুকরিটা তার ভরে কিনা তার নিদারুণ সন্দেহ থাকে। সে ভাবে পুরানো সেই রূপালী সম্পদের কথা!

আমাদের এই ধীবরের মত ভাবনা অবশ্য আরো অনেকের যদিও তারা সবাই নিজের পরের দিনের খাবার সংস্থানের জন্য উদ্বিগ্ন হয়।

স্পেনের পশ্চিম উপকূলের বন্দর ভিগো থেকে রাতের আঁধারে উত্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছে বেশ বড় একটা মাছধরা জাহাজ 'মারকো চিনকো'। সামনে ঝড়ো হাওয়ায় বরফাকীর্ণ শীতল সমুদ্র একই বন্দর থেকে দক্ষিণে দক্ষিণ আমেরিকার একেবারে প্রান্তে ফকল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে 'ফারপেস্কা ক্যুয়ার্তো'—ওখানে স্কুইড ধরবে বলে। ২৫৬ ফুট দীর্ঘ ট্রলার 'এস্তাই' চলেছে উত্তর আটলান্টিকের সেই অংশে যেখানে মাছের ভাগ নিয়ে দারুণ বিবাদ চলছে, এমনকি গোলাগুলীও। ওদের সবার নাবিকদের মনে

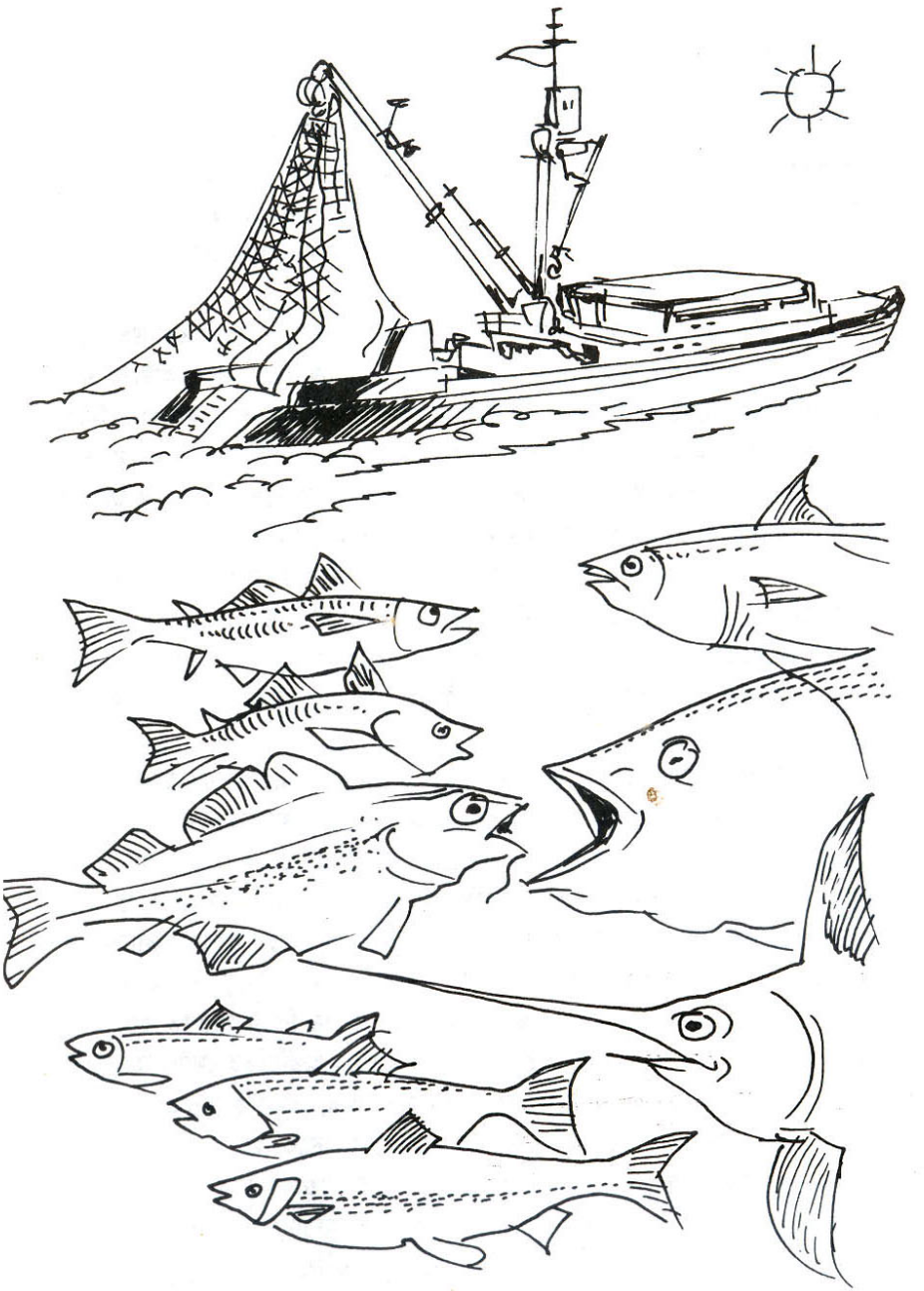
শান্তি নেই। অশান্তির কারণ মোটের উপর একটাই—মাছ ধরার মানুষ অনেক, যন্ত্র অনেক, কিন্তু মাছ কম। তাই যদিও তারা চলেছে সব রকম পরিস্থিতিতে মাছ ধরতে দুনিয়ার সবচেয়ে দক্ষ ও যোগ্য যন্ত্রযান নিয়ে, তবুও তারা চিন্তিত।

এ চিন্তার মানে এই নয় যে দুনিয়ার মাছের বাজারে আকাল নেমেছে, মাছের দাম আকাশচুম্বী হয়েছে, অথবা মাছ ধরার পেশায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে, মোটেই তা নয়। বরং এখন সাগর বছরে যে মাছ উপহার দিচ্ছে তার পরিমাণ ৭.৮ কোটি মেট্রিক টন—সর্বকালের সর্বোচ্চ পরিমাণ—আর এটি আপাতত বেশ স্থায়ী বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু তবুও মাছের পেশাজীবীদের দুশ্চিন্তার কারণ রয়েছে।

গত পঞ্চাশ বছর ধরে মাছ ধরার ক্ষেত্রে একটি মহোৎসব গেছে। এই উৎসবের রথগুলো হচ্ছে মোট ৩৭ হাজার শক্তিশালী মাছ ধরা জাহাজ—যার প্রত্যেকটিকে এক একটি কারখানা বলেই মেনে নিতে হয়। সাগর বুকে এতগুলো চলন্ত কারখানা নিয়ে বিশ্বজোড়া যে প্রকাণ্ড মাছ ধরা শিল্প, তাতে কাজ করছে প্রায় দশ লক্ষ মানুষ। কারখানারূপী ঐ ফ্রিজার-ট্রলার জাহাজগুলোর প্রায় প্রত্যেকটি প্রতি ঘণ্টায় এক টন বা তারো চেয়ে বেশি মাছ ধরে, প্রক্রিয়াজাত করে, সংরক্ষণ করতে সক্ষম!

সাধারণ ট্রলার, নৌকা ইত্যাদি বাহনে সনাতন মৎসজীবী যারা মাছ ধরছে তাদের সংখ্যা অবশ্য আনুমানিক দেড় কোটির মত হবে—যাদের মধ্যে আমাদের দেশের ধীবররা তো রয়েছে। এই দেড় কোটি মানুষ সারা বছরে যা ধরেছে তা পৃথিবীর মৎস্য আহরণের অর্ধেক মাত্র। বাকি অর্ধেক ধরছে ঐ দশ লক্ষ পেশাজীবী—তাদের কারখানা জাহাজগুলোর উপরে।

বড় দুশ্চিন্তা যা নিয়ে তা হল স্থানে স্থানে মাছ উৎপাদন ক্ষেত্রগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নষ্ট হবার বিবিধ কারণ রয়েছে। নানাভাবে সমুদ্রের পানির দূষণ তার মধ্যে একটি। আর একটি কারণ হল উপকূলে অগভীর সমুদ্রের জলাভূমিগুলোতে মাছের যে স্বাভাবিক আতুড়-আবাসগুলো রয়েছে সেগুলোর বিনষ্টি। অনেক মাছ এখানে ডিম দেয়, বাচ্চারা এখানেই বড় হয়। অথচ অর্থনৈতিক নানা কারণে মাছের এই আতুর আবাসগুলোকে নষ্ট করে অন্য কাজে লাগানো হচ্ছে। আমাদের দেশের দক্ষিণ উপকূলের ম্যানগ্রোভ বনভূমিগুলো ওর একটি উদাহরণ। মাছ ধরা যখন থেকে বড় শিল্পে পরিণত হয়েছে—তখন থেকে তার নিয়মনীতিও হয়েছে বড় শিল্পের মতই—অর্থনীতির মোটা হিসেবেই নিয়ন্ত্রিত। ফলে একটি কারখানা-জাহাজ যখন মাছ ধরে, এমনকি উন্নত যে কোন ট্রলারও যখন মাছ ধরে, তাকে তখন সেগুলোই বেছে নিতে হয় ব্যবসার নিরিখে যেগুলো মূল্যবান। অলাভজনক বা কম লাভজনক মাছ যেগুলো উঠে আসে সেগুলো পরিত্যক্ত হয়। একদিকে এটি যেমন বিশাল এক অপচয়, অন্যদিকে পরিত্যক্ত মৃত মাছ দূষণেরও বড় কারণ হয়। মাছ উৎপাদন ক্ষেত্র নষ্ট হবার এটিও একটি কারণ।



উৎপাদন ক্ষেত্র নষ্টের সবচেয়ে বড় কারণ অবশ্য মাছের অতি-আহরণ। শিল্প চলে শিল্পের নিয়মে অদূরবর্তী হিসেবে, পরিবেশের দূরদর্শী হিসেবে নয়। কারখানা-জাহাজ নিয়ে মাছ যারা ধরতে যায় তারা পারতপক্ষে কিছু রেখে আসতে চায় না। অথচ একটি মাছ উৎপাদন ক্ষেত্র ভবিষ্যতে এ উৎপাদন ক্ষেত্র হিসেবে টেকসই হতে হলে কি পরিমাণ মাছ ওখানে সব সময় মজুদ থাকতে হবে তার একটি নিম্নসীমা রয়েছে। এই সীমা অতিক্রম করলে এ ক্ষেত্র আর উর্বর থাকে না।

দুনিয়ার অনেক মৎস্য বন্দরের মত স্পেনের ভিগো থেকে ঐ শক্তিশালী জাহাজগুলো উত্তরে, দক্ষিণে অথবা পশ্চিমে যখন এগিয়ে যাচ্ছে—সেগুলোর নাবিকরা ভাবছে ভবিষ্যতের কথা। ওদের এই যাত্রাতেই ওরা ছোট বড় নানা সংঘাতের সম্মুখীন হবে। শিগগির যদি এসব সংঘাতের অবসান খুঁজে পাওয়া না যায় তা হলে ভবিষ্যতে তা বড় আকারের বিস্ফোরণে পরিণত হওয়া বিচিত্র নয়। এখানে যা সংকট তার প্রকৃতিটি জটিল। সমুদ্র সবার জন্য অবারিত। কাজেই মাছ-উৎপাদন ক্ষেত্রের ভবিষ্যত রক্ষা করতে হলে সবার মধ্যে সমঝোতা প্রয়োজন। অথচ প্রধানত শক্তিধর ও সক্ষম কিছু কিছু দেশের জন্য এটি বছরে ৭০০ কোটি ডলার আয়ের একটি বিশাল শিল্পও বটে। তাদের তাৎক্ষণিক স্বার্থ এর মধ্যে বড় বেশি জড়িয়ে। তা ছাড়া এসব দেশের ঐতিহ্য আর জীবন ধারার সঙ্গে স্বাধীনভাবে মৎস্য শিকারের রীতিগুলো এমনভাবে মিশে আছে যে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ ও আন্তর্জাতিক সমঝোতাগুলো অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রবণতা রাখে।

সংবাদপত্রে এ রকম সংবাদ আজকাল সব সময়েই থাকছে :

উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর। কুরিল দ্বীপপুঞ্জের বিতর্কিত জলভাগে অবৈধভাবে মাছ শিকারের অভিযোগে রাশিয়ান জল সীমান্তরক্ষীরা দুটি জাপানি জাহাজের উপর গোলাবর্ষণ করলে একটি জাহাজ ঘায়েল হয় এবং কয়েকজন আহত হয়েছে।

স্কটল্যাণ্ড। স্কটিশ জেলেরা একটি রাশিয়ান ট্রলার আক্রমণ করে ৩,৮০,০০০ ডলার মূল্যের কডমাছ নষ্ট করে দিয়েছে।

পাটগোনিয়া। আর্জেন্টিনার গানবোট তাইওয়ানের একটি ট্রলারকে তাড়া করে এবং এর উপর গোলাবর্ষণ করে। ট্রলারটি ডুবে যায়, তবে নাবিকদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে।

এভাবে নানা দেশের সীমান্তবর্তী জলভাগে মৎস্য-যুদ্ধ চলছেই। প্রায় সবাই এখন স্বীকার করেন যে অতি আহরণের ফলে মৎস্যক্ষেত্রগুলো বিপন্ন হয়ে পড়েছে। একদল অন্য দলকে এজন্য দোষারোপ করে। ছোট নৌকার জেলেরা দোষ দেয় কারখানা-জাহাজ ফ্রিজার ট্রলারগুলোকে। এ সব জাহাজের ক্যাপ্টেনরা আবার দোষ দেয় দস্যু ট্রলারদেরকে যারা ঘন-খোপের জালসহ অন্যান্য অবৈধ সব প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত মাছ ধরে চলছেই। এটাও সবাই মানছেন যে জাতিসংঘের উদ্যোগ সব দেশের উপর কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু সে রকম নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সমস্যা থেকেই যাচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের দিনগুলোতে সমুদ্র মাত্রই ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত। যে কেউ এর যে-কোন অংশে গিয়ে খুশিমত মাছ ধরতে পারতো। আন্তর্জাতিক আইনের কোন বাধা ছিল না। এর মধ্যে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপের প্রক্রিয়া শুরু হয় মহাযুদ্ধের পর। সত্তরের দশকে ব্যাপারটি ত্বরান্বিত হয়। এ সময় অধিকাংশ দেশ তাদের সামুদ্রিক নিয়ন্ত্রণ আগের ১২ মাইল থেকে ২০০ মাইলে সম্প্রসারিত করে। অর্থাৎ তখন থেকে এই দু'শ মাইলের মধ্যে মৎস্য সম্পদ আহরণের একচেটিয়া অধিকার শুধু সেই দেশেরই থাকছে—দূরবর্তী জাহাজ-বহর এসে এখানকার মাছ তুলে নিতে আইনত পারবে না।

সে সময় এই দু'শ মাইল নিয়ন্ত্রণকে অনেক বেশি মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে মৎস্যক্ষেত্রে অতি আহরণ রোধের জন্য এটি মোটেই যথেষ্ট নয়। কারণ এর অভ্যন্তরীণ মৎস্য দলও প্রায়ই দু'শ মাইল সীমানার বাইরে আসা-যাওয়া করে এবং সেখানে নির্বিচারে শিকার-রত ভিনদেশী জাহাজ বহরের হাতে ধরা পড়ে। যে সব দেশ তাদের নিজের সমুদ্রের মৎস্য সম্পদের উপর বেশি নির্ভরশীল তারা এখন নিয়ন্ত্রণ আরো সম্প্রসারিত করার পক্ষপাতী। তাদের দাবি কখনো প্রকাশ করা হচ্ছে শান্তিতে সম্মেলনে, আবার কখনো সমুদ্রে মৎস্য যুদ্ধে।

কানাডার বিষয়টি দেখা যাক। বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি দেখিয়েছেন যে নিউফাউন্ড-ল্যান্ডের নিকটে গ্র্যাণ্ড ব্যাংক অঞ্চলের সমৃদ্ধ মৎস্য ক্ষেত্রগুলো এখন সম্পূর্ণ বিনষ্টের পথে। একে রক্ষা করার জন্য কানাডা এ অঞ্চলে নিজের মৎস্য শিকার বন্ধ করে দিয়েছে যার ফলে প্রায় ৪০,০০০ মানুষ কর্মচ্যুত হয়েছে। অথচ অনেক দূরের পর্তুগাল, স্পেন ও অন্যান্য দেশ থেকে আসা কারখানা জাহাজ ঠিকই এখনো ২০০ মাইল সীমানার বাইরে যথেষ্ট মাছ ধরে যাচ্ছে। এর ফলে কানাডা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। প্রতিদিন কানাডার গুপ্তচর বিমানগুলো রাডার সুসজ্জিত হয়ে সমুদ্রের উপর নিচুতে উড়ে বেড়ায় অতি-আহরণের সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের জন্য। এসব তথ্য মৎস্য-যুদ্ধের ঠাণ্ডা লড়াই পর্যায়ে ব্যবহৃত হবে। যে কোন সময় এটি উত্তপ্ত লড়াইয়ে পরিণত হলেও অবাক হবার কিছু নেই। কানাডার মৎস্য মন্ত্রীকে বাধ্য হলে 'অন্যপন্থা' নেবার হুমকীও দিতে শোনা গেছে।

কানাডার মত প্রস্তুত দেশও সপ্ত সমুদ্রের অবাধ বিচরণকারী কারখানা জাহাজগুলোর ক্ষমতার কাছে অসহায়। যারা ধরছে সে সব দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে জাপান, চীন, পেরু, চিলি, রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র। অতিকায় কারখানা-জাহাজ অবশ্য অধিকাংশ জাপান, রাশিয়া, চীন আর যুক্তরাষ্ট্রের দখলে। ১৯৮৯তে সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছার পর থেকে বিশ্বের মোট মৎস্য আহরণ প্রায় সেখানেই স্থির রয়েছে—আর বাড়ছে না। এর কারণ চেষ্টার অভাব, বা নিয়ন্ত্রণচুক্তির ফল নয়, বরং প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা। আশংকা করা হচ্ছে এই প্রাপ্তি শিগগির নিম্নগামী হতে পারে। অথচ বিশ্বে মাছের চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই বৃদ্ধি যত না গরীবের আমিষ হিসেবে তার চেয়ে অনেক বেশি ধনী ভোজন-রসিকদের রসনা তৃপ্তিতে। চাহিদার শীর্ষে যদিও রয়েছে চীন—সেটি অবশ্য তার জনসংখ্যার কারণে-ওখানে জনপ্রতি মৎস্য আহারের পরিমাণ বছরে ১২.২ কিলোগ্রাম। অন্যান্য বড় চাহিদা আসে জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া থেকে।

জাপানিদের প্রত্যেকে গড়ে বছরে ৬৬.৬ কিলো মাছ খায়-যা বিশ্বের সর্বোচ্চ। এখানকার এবং অন্যান্য দেশের মৎস্য প্রিয় ভোজন রসিকদের পাতে দেবার এখন সাগরের কূলীন কয়েকটি মাছের উপর চাপ অত্যন্ত বেশি।

এমনি দুটি কুলীন মাছ হল টুনা আর বিলফিশ। বিশালদেহী এই মাছ দুটির এমন আদর যে দুই গ্রাসে জাপানের প্রিয় খাদ্য সুশির সঙ্গে খাওয়া হয়ে যায়। মাত্র ঐ টুকুন ভাল টুনার পেটির মাছ টোকিওর বাজারে ৭৫ ডলারে বিক্রয় হতে পারে। ফলশ্রুতিতে অত্যন্ত উন্নত সব প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ মাছের শিকার চলছে হরদম। সমুদ্র থেকে মাছের দলকে সনাক্ত করার পর হারপুন দিয়ে এর উপর আক্রমণ চলে।

টুনা বা বিলফিশের মত এমন কুলীন নয় অথচ বিশ্বজোড়া জনপ্রিয় এমন মাছের গোষ্ঠী হল কড, পোলোক আর হ্যাডক। এর মধ্যে কড আর হ্যাডকের আদর বেশি। ফলে উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিকের এক কালের সমৃদ্ধ কডের উৎপাদন ক্ষেত্র এখন ধ্বসে পড়েছে। যেটি এখনো প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে তা হল পোলোক। এই মাছকে এক সময় শুধু পশুখাদ্য তৈরির উপযুক্ত মনে করা হলেও এখন একে প্রক্রিয়াজাত করে 'ফিশস্টিক' ও ফাস্টফুড' হিসেবে দেদার ব্যবহার করা হচ্ছে।

কড, হ্যাডক ইত্যাদি জনপ্রিয় মাছের ক্ষেত্রে টান পড়ায় এখন সমুদ্রের মৎস্য শিকারীদের নজর অধিকতরভাবে যাচ্ছে রেডফিশ, সী-ব্রীম, রাফীস-ইত্যাদি বিকল্প মাছের দিকে। এদের জনপ্রিয়তা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের। এ সব মাছের অতি-আহরণের ক্ষেত্রে বিপদ আরো বেশি। কারণ এদের জীবতত্ত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু এখনো অজানা রয়েছে। মনে করা হয় যে অরেঞ্জ রাফীস মাছের আয়ুষ্কাল মানুষের চেয়েও বেশি এবং এরা দেরীতে বয়স প্রাপ্ত হয়। এ ধারণা সত্যি হলে এদের নির্বিচার শিকার বয়সপ্রাপ্তির আগেই অনেক মাছ তুলে ফেলে বিলুপ্তির পথ আরো সহজ করে দেবে।

গভীর সমুদ্রের ছোট মাছের মধ্যে হেরিং, সার্ডিন এবং আঞ্চোভি কোন কোন দেশে বেশ আদর করে খাওয়া হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আঞ্চোভির শুটকিও খুব জনপ্রিয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকাল ব্যাপক ভিত্তিতে এ সব মাছ ধরা হচ্ছে মানুষের খাওয়ার জন্য নয়—মাছের ময়দা হিসেবে পশুখাদ্য করার জন্য এবং সার তৈরির জন্য। ফলে তাদের চাহিদা হয়েছে আকাশচুম্বী। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে হেরিং এর মূল উৎপাদনের যোগাড় রয়েছে। আর দক্ষিণ আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে বিপুল পরিমাণে আঞ্চোভি ধরা হচ্ছে।

অনেকটা আমাদের ইলিশের মত স্বভাব সমুদ্র ও নদীর মাছ স্যামনের। আর আমাদের দেশে ইলিশের যেমন আদর, বিশ্বজুড়ে স্যামনেরও তাই। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিম উপকূলে আলাস্কা, ওয়াশিংটন স্টেট এর সমুদ্র চিরকাল স্যামনকে লালন করেছে। বছরের সঠিক মৌসুমে অনেকগুলো নদীর উজান বেয়ে এগুলো সাগর থেকে ভেতরে ঢুকে। ১৯৯২ এর আগে 'মৃত্যুর দেয়াল' নামে পরিচিত জালগুলো উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে স্যামনকে নির্বংশ করছিল। এখন ঐ জাল নিষিদ্ধ হওয়াতে অবস্থা অনেকটা ভাল।

সমুদ্রের মাছ ধরা জাহাজের বহরে এখন বড় পরিবর্তন এসেছে। আগেকার ছোট ছোট পারিবারিক ট্রলার এখন বিলুপ্ত হতে চলেছে। অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক বিশাল কারখানা-জাহাজের এখন জয়-জয়কার। এমনি একটি বড় জাহাজ ৪০০ ফুট লম্বা হতে পারে আর দৈনিক ৬০০ টোন পলোক মাছ ধরে তাকে জাহাজের কারখানাতেই 'সুরিমি' মৎস্য খমীরে পরিণত করতে পারে। এর টানা জাল হতে পারে আধমাইল দীর্ঘ। 'সোনার' যন্ত্রে শব্দতরঙ্গের প্রতিফলনের সাহায্যে মাছের ঝাঁকের অবস্থান জেনে নিয়ে জাহাজ সেদিকে চলে যায় আর তার বিশাল দীর্ঘ জালে মাছগুলোকে তাড়িয়ে কাছে নিয়ে আসে। কোন কোন জাহাজ নিজে বৃত্তাকার গভীর জালের মাঝখানে থেকে সাগরের একটি বড় অংশ জালে ঘিরে ফেলতে পারে।

জাল টেনে মাছ জাহাজে আনার পর যান্ত্রিকভাবে জালকে গুটিয়ে রাখা হয়, আর মাছের বিরাট স্তূপ করা হয় নির্দিষ্ট পাটাতনের উপর। মাছকে ওজন করার পর শুরু হয় তার প্রক্রিয়াকরণের পালা। কেটে নাড়িভুড়ি পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলা হয়। কাটা মাছকে সংরক্ষণের জন্য দেয়া হয় উপযুক্ত সংরক্ষক দ্রব্য। এরপর প্রয়োজনে একে 'সুরিমি' খমীরায় পরিণত করা হয়। সুরিমির বড় বড় ব্লকগুলো দ্রুত শীতল করে বাক্সে পুরে বড় বড় হিমায়কে রেখে দেয়া হয়। নাড়িভুড়িও ফেলা যায় না। সেগুলো থেকে ওখানেই তৈরি হয়ে যায় মাছের ময়দা।

দীর্ঘদিন সমুদ্র থেকে কঠিন কাজ করে যে ধীবর আর নাবিকরা, তাদের থাকার জন্য, অবসর বিনোদনের জন্যও চমৎকার ব্যবস্থা কারখানা জাহাজগুলোতে। ক্যাফেটোরিয়া, বাথটাব, জিমনেশিয়াম সবই থাকে। এরকম সব জাহাজের শক্তিশালী বহর যখন একটি মৎস্য ক্ষেত্রকে আক্রমণ করে তখন তা মাছের মরুভূমি হতে আর কি বাকি থাকে। কোন কোন দেশ তাই তার আওতাধীন এলাকায় মাছ ধরার নিয়ন্ত্রণ বসিয়েছে। এলাকায় কতজন কত মাছ ধরবে, কি মাছ ধরবে তার জন্য কোটার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই কোটা অনুসারে লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে মাছ ধরা সীমার মধ্যে রাখা হয়। কিন্তু সে ব্যবস্থায়ও প্রচুর সমস্যা দেখা যাচ্ছে। লাইসেন্স বণ্টন করার পদ্ধতি কি হবে। মৎস্যজীবীদের স্বার্থ রক্ষার উপায় কি? বড় বড় কর্পোরেশন তাদের কাছ থেকে লাইসেন্স কিনে পুঁজির জোরে পুরো মৎস্যক্ষেত্র কুক্ষিগত করবে না তার নিশ্চয়তা কি? তা ছাড়া আহরণকৃত মৎস্যের পরিমাণ যেখানে সুনির্দিষ্ট করা আছে সেখানে সবারই প্রবণতা হবে সবচেয়ে দামী মাছগুলোই শুধু রেখে অন্য ধরা মাছগুলো ফেলে দিয়ে অপচয় করা এটি বন্ধ করার উপায় কি?

তারপর আরও সমস্যা—যেমন দেশের অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমার অর্থাৎ ২০০ মাইলের ঠিক বাইরে যথেচ্ছভাবে মাছ ধরা কিভাবে রোধ করা যায়। অথচ এখানে নিয়ন্ত্রণটিও গুরুত্বপূর্ণ—নইলে মৎস্যক্ষেত্রের আবাদ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এতে বাধা দিতে গিয়েই সূত্রপাত হয়েছে সাম্প্রতিক মৎস্যযুদ্ধগুলোর। সাম্প্রতিক একটি সংবাদপত্র রিপোর্ট থেকে মৎস্যযুদ্ধের প্রকৃতিটি জানা যায় :

নিউফাউডল্যান্ড : মার্চ ৯, ১৯৯৫

১২ : ৫০। কানাডার মৎস্য দফতরের দু'টি জাহাজ এবং কানাডিয়ান উপকূলরক্ষী বাহিনীর দু'টি জাহাজ স্পেনের মৎস্য শিকারী জাহাজ 'এস্টাই' এর মুখোমুখি হয়।

বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা এস্টাইতে আরোহণের চেষ্টা করলে স্পেনের জাহাজটি তার জাল কেটে দ্রুত পালিয়ে যায়।

বিকেল ১ : ৪০। এর পশ্চাতধাবন করে রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশের একটি দল আবার আরোহণের চেষ্টা করে। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

বিকেল ৪ : ৩০। স্পেনীয় জাহাজ এস্টাইকে লক্ষ্য করে চারবার কামান দাগা হয় এবং স্পেনীয় নাবিকদেরকে পাটাতনের নিচে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

বিকেল ৪ : ৫২। মৎস্য বিভাগ এবং পুলিশ বাহিনীর কর্মকর্তারা এস্টাইতে আরোহণ করেন এবং এর ক্যাপ্টেনকে গ্রেপ্তার করেন। সবগুলো জাহাজ এরপর সেন্ট জনের দিকে ফিরে আসে।

মৎস্যযুদ্ধের ইতিহাসে এই ঘটনাটি বিশেষ গুরুত্ব রাখে। কারণ মৎস্য ক্ষেত্রের বৃহত্তর স্বার্থে আইনত আন্তর্জাতিক সমুদ্রে গিয়েও যে ব্যবস্থা নেয়া যায় কানাডা এক তরফাভাবে সেটি প্রমাণ করলো। 'এস্টাই'কে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসার পর নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের বন্দরে তখন হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়ে এই ব্যবস্থাকে অভিনন্দন জানায়। কানাডীয় কর্তৃপক্ষ পরে সমুদ্র থেকে এস্টাইয়ের জাল কেটে পরিত্যক্ত জাল উদ্ধার করে। দেখা যায় যে সে জালের খোপ বে-আইনীভাবে ছোট। জাহাজটির খোলেও পাওয়া যায় প্রচুর অপ্রাপ্ত বয়স্ক মাছ। স্পষ্টত এ ধরনের বে-আইনী মৎস্য শিকারই ঐ অঞ্চলের মূল্যবান মৎস্য প্রজাতিকে ধ্বংসের সম্মুখীন করেছে।

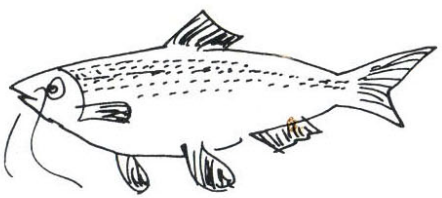
মাছের জগতটি ছোট হয়ে এসেছে বিশ্বজোড়া সমুদ্র সিঞ্চনের কারণে। সবাইকে সবার মত করে চলতে দেয়ার সুযোগ এখানে নেই। তাই উপরের ঘটনার মত বিক্ষুব্ধ অবস্থার মধ্য দিয়ে অদূর ভবিষ্যতে এ জগতটি নতুন একটি ভারসাম্য খুঁজে পাবে।

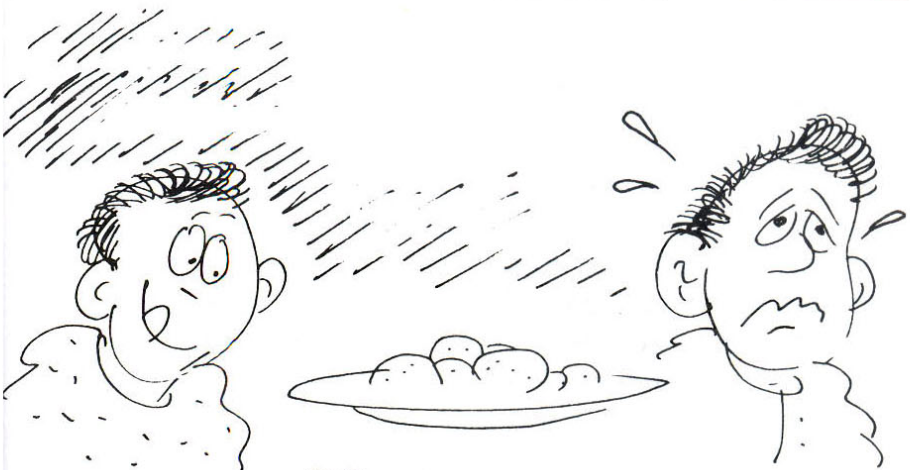
বাংলাদেশের একটি ছোট মৎস্য বন্দর কুয়াকাটা। আমতলী, খেপুপাড়া হয়ে চলনসই একটি রাস্তা চলে গেছে পটুয়াখালী থেকে কুয়াকাটা—যেভাবে গেছে তাতে মনে হয় জায়গাটি দেশের মূলস্রোত থেকে অনেক দূরে। পথে অবহেলিত কয়েকটি ফেরী। কিন্তু এখানে রয়েছে দেশের অন্যতম সুন্দর একটি সমুদ্রতট-বেড়াবার মত চমৎকার জায়গা। কিন্তু বেড়াবার সুযোগগুলোর কোনটিই এখানে উপস্থিত নেই। তেমনি সামুদ্রিক মাছের আহরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও এখানে তার জন্য কোন সুযোগ সুবিধাই নেই। আছে শুধু ছোট ছোট অনেক দেশী ট্রলার। এরা বেশ কয়েকদিনের জন্য চলে যায় উপকূলের অদূরবর্তী সমুদ্রে মাছ শিকারে। পরিবার-পরিজনরা উপকূলের কাছের গ্রামগুলোতে বাস করে। যখন সমুদ্র তীরে ট্রলারগুলো দাঁড়িয়ে থাকে—তখন শতশত আত্মীয়-স্বজনকে বালির উপর দিয়ে হেঁটে খাবার দাবার, অন্যান্য রসদ নিয়ে ট্রলারে তাদের কাছে যেতে দেখা যায়। তারপর তারা যাত্রা করে সমুদ্রের গভীরে।

এখানে উপকূল থেকে কয়েক মাইল দূরে মৎস্য ক্ষেত্রে তারা গড়ে তোলে এক ট্রলারের শহর—অস্থায়ীভাবে। রাতের আঁধারে ট্রলারের আলোতে তাকে একটি জমজমাট শহরই বলা চলে। ছোটছোট নৌকা করে যাতায়াত চলে এক ট্রলার থেকে

অন্য ট্রলারে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসর বিনোদনও চলে। তবে কাজটাই মুখ্য—জাল টেনে মাছ ধরা। কি সেই মাছ। সমুদ্রের ইলিশ এর বড় একটি অংশ। তা ছাড়া রয়েছে চিংড়ি। সমুদ্রের অন্যান্য মাছের মধ্যে ছুরি, রূপচান্দা, চাপিলা, লাক্কা এসব প্রচুর। আর আছে পোটকা আর হাঙ্গর। পোটকা মাছের রয়েছে বিষ থলে, সেটি সযত্নে দূর না করলে মাছ খেয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা। তবুও সে মাছ ধরা হয়, বাজারজাত করা হয়। হাঙ্গরের ব্যাপারটিও তাই। এখানে হাঙ্গরের মূল্য শুধু তার পাখনার-শার্ক ফিন স্যুপের জন্য বিদেশী ক্রেতারা কিনে নেবে এগুলো রপ্তানির উদ্দেশ্যে। ট্রলার থেকে কিছু মাছ হিমায়িত করে চালান দেয়া হচ্ছে চট্টগ্রামের দিকে সমুদ্র পথে। বাকি মাছকে শুটকি করা হচ্ছে সমুদ্র তীরে বালির উপরেই। সেখানেই মাছকে কেটেকুটে বাঁশের মাচানে শুকাতে দেয়া হচ্ছে। মাছের কাটাকুটি পরিত্যাক্ত অংশে দূষিত হচ্ছে সমুদ্রতীর, দূষিত হচ্ছে তীরের পানি। অনেক কুকুর বালিতে ঘোরাঘুরি করছে মাছের বর্জ্য অংশগুলো টানাটানি করে খাওয়ার জন্য।

বিশ্বজোড়া সমুদ্র সিঞ্চনের হাওয়া কুয়াকাটায় লাগে না। এখানে অনুভূত হয় না সামুদ্রিক মাছের বিশাল চাহিদার ফলে সমৃদ্ধির ছিটেফোঁটায়ও। মৎস্যযুদ্ধের খবর এখানে অপ্রাসঙ্গিক। অথচ এখানকার ধীবর এখানকার নাবিক কোন অংশেই কম সাহসী নয়। এখানকার সমুদ্রও নয় বিশ্ব-সমুদ্রের থেকে আলাদা কিছু। তা হলে কেন আমরা পারছি না সত্যিকার অর্থে কাজে লাগাতে আমাদের এই রূপালী সম্পদকে?





মিষ্টি মুখ অনেক দুখ

মিষ্টি মুখ করার ইচ্ছে মোটামুটি সবার মধ্যেই প্রবল। মিষ্টির প্যাকেটটি সামনে রেখে আপনি যে রকম বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারেন না, তেমনি পারে না মায়ের পেটের শিশুটি যার এখনো জন্মই হয়নি। মায়ের জরায়ুতে শিশু থাকে একটা তরল পদার্থে ঘেরা অবস্থায়। এমনাইওটিক তরল নামে পরিচিত এই পানি শিশু মাঝে মাঝে ঢোক গিলে খায়। দেখা গেছে ইনজেকশন করে জরায়ুতে একটু স্যাকারিন ঢুকিয়ে দিলে শিশুর এই ঢোক গেলা অনেক বেড়ে যায়। মিষ্টির টান যাবে কোথায়?

তবে দোষটা শুধু মানব শিশুরই নয়। প্রাণী জগতে এটা মোটামুটি সাধারণ ব্যাপার। ইঁদুরের সামনে একটা পাত্রে চিনি গোলা পানি এবং আর এক পাত্রে পুষ্টিকর প্রিয় খাবার দিয়ে দেখা গেছে যতক্ষণ চিনির পানি থাকবে ততক্ষণ সে অন্যটার দিকে কোন মনোযোগ দিচ্ছে না। সবার ক্ষেত্রেই চিনির প্রতি আকর্ষণটা অতি স্পষ্ট। যেটা ততো স্পষ্ট নয় কিন্তু অতি সত্য, তা হল বেশি চিনি খাওয়া আমাদের জন্য অনেক দুর্ভোগ বয়ে আনতে পারে।

চিনি একটা শর্করা জাতীয় খাবার। এর নানা প্রকারভেদ রয়েছে। একটা হল 'সুক্রোজ' যা আখ থেকে পাওয়া আমাদের অতি পরিচিত চিনি। তা ছাড়া রয়েছে দুধের চিনি—ল্যাকটোজ, ফলের চিনি—ফ্রুকটোজ, রক্তে থাকা চিনি—গ্লুকোজ ইত্যাদি। শরীরের জন্য শর্করা জাতীয় খাবারের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে—সেটা ঠিক। কিন্তু নানা রকম মিষ্টি খাবার অতি মাত্রায় খেলে সেই শর্করাটার বড় অংশ চিনি থেকেই আমরা পেয়ে যাই। অথচ এটা যদি আমরা শস্য, ফল, সব্জি প্রভৃতি থেকে পেতাম তা হলে শর্করার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজদ্রব্য, আঁশ, পানি প্রভৃতিও খাবারের সাথে এসে যেতো। চিনিতে এর কিছুই নেই—আছে শুধু ক্যালোরি অর্থাৎ শক্তি উৎপাদনের উপাদান।

আসলে খাবারের মধ্যে সুক্রোজ চিনি থাকার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই—এর কাজ অন্য খাবারগুলোই ভাল করতে পারে। শক্তি উৎপাদনের জন্য আমাদের শরীর ভাত রুটি প্রভৃতি খাবারকে চিনিতে পরিণত করে নিতে পারে। তা ছাড়া ফলমূলের মধ্যে চিনিতো রয়েছেই।

একটা কথা প্রায়ই বলা হয় চিনি হল 'ইনস্ট্যান্ট এনার্জি' অর্থাৎ তাৎক্ষণিক শক্তি পাবার উপায়। কথাটাকে ভুল বোঝার অবকাশ যথেষ্ট আছে। খালি পেটে বেশি চিনি খেলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। এর ফলে শরীরে 'ইনসুলিন' নামক জিনিস এসে রক্ত থেকে বাড়তি গ্লুকোজ বের করে নেয় আর তাকে মজুদ করার গুদামে পাঠিয়ে দেয়। শরীরে চিনি মজুদ করার ব্যবস্থা হল কলজের মধ্যে গ্লাইকোজেন হিসেবে অথবা চর্বির মধ্যে ট্রাইগ্লিসারাইড হিসেবে। শরীরের পরিশ্রম হলে প্রথমে প্রথম গুদাম থেকে মজুদের তলব হয় অর্থাৎ কলজে থেকে গ্লাইকোজেনের; এতে না কুলালে চর্বি থেকে ফ্যাটি এসিডের। পরিশ্রমের সময় মাংসপেশীতে বাড়তি শক্তির প্রয়োজন বলেই মজুদের এই তলব।

পরিশ্রমের সময় ছাড়া ওভাবে চিনি খেলে তা স্রেফ মজুদের পরিমাণ বাড়ায় মাত্র শক্তি তৈরির কাজে লাগে না। দীর্ঘ পরিশ্রমকালে মাঝে মাঝে অল্প অল্প চিনির দলা খেলেই শুধু তা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়িয়ে মাংসপেশীর শক্তি যোগাতে পারে।

অপরপক্ষে চিনি বেশি খাবার ভোগান্তি অনেক। যেমন মিষ্টি মুখের অভ্যাসের সাথে বেঢক মোটা হয়ে পড়ার সম্পর্কটা বড় বেশি। মোটা অবশ্য যে-কোন রকমের শর্করা খাবার বেশি খেলেই হতে পারে। কিন্তু চিনিতে ওটার ভয় বেশি। কারণ চিনিতে অল্প খাবারেই অনেক ক্যালোরি—পেট ভরার বা টের পাওয়ার অনেক আগেই প্রয়োজনের বেশি ক্যালোরি খাওয়া হয়ে যায়। আধসের আপেল থেকে যেই ক্যালোরি পাওয়া যায় মাত্র এক ছটাক মিষ্টি লজেন্স থেকেই তা পাওয়া যায়। আধ সের আপেল খেলে যথেষ্ট কিছু খেলাম বলেই মনে হবে সেই তুলনায় এক ছটাক লজেন্স কিছু না।

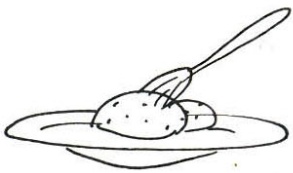
যখন তখন মিষ্টি জিনিস খাওয়া নিঃসন্দেহে দাঁতের জন্য ক্ষতিকর। দাঁতে লেগে থাকা চিনিকে মুখের ব্যাকটেরিয়া এক ধরনের এসিডে পরিণত করে। এই এসিড দাঁতের রক্ষাকারী আবরণ নষ্ট করে দাঁতের ও মাড়ির নানা অসুখ হবার সুযোগ করে দেয়। এই ব্যাপারে অবশ্য আপনি কতখানি মিষ্টি খেলেন সেটা বড় কথা নয়, দাঁতের ওপর মিষ্টি কতক্ষণ থাকছে সেটাই বড় কথা। চুইংগাম, লজেন্স এগুলোই তাই বেশি ক্ষতিকর। এদিক থেকে নিরাপদ ব্যবস্থা হচ্ছে যতবার মিষ্টি খাবেন, ততবার দাঁত মেজে কুলি করে ফেলা।

মিষ্টি খাওয়া, মুটিয়ে যাওয়া এ সবের সাথে সম্পর্কিত সবচেয়ে ভীতিপ্রদ অসুখ ডায়াবেটিস। রক্তের বাড়তি চিনি সরিয়ে নেবার দায়িত্ব হল ইনসুলিনের। প্লীহা থেকে এটা তৈরি হয়। ডায়াবেটিস হলে এটা ঠিকমতো তৈরি হতে পারে না বলে রক্তের বাড়তি চিনি সরতে পারে না। ডায়াবেটিস রুগী বেশি চিনি খেলে রক্তের গ্লুকোজ বিপদজনকভাবে বেড়ে যেতে পারে। তা ছাড়া ধারণা করা হয় যে বেশি চিনি খাওয়াটাই প্রকারান্তে ডায়াবেটিস সৃষ্টির জন্য দায়ী হয়ে দাঁড়াতে পারে। অন্তত মুটিয়ে

পড়ার সাথে ডায়াবেটিসের প্রবণতার বৃদ্ধির প্রমাণ রয়েছে। আর চিনি মুটিয়ে পড়তে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে।

হৃদরোগের সাথে বেশি চিনি খাবার সম্পর্কের কথা অনেকে বলে থাকেন, তবে সেটা সবাই মানেন না। বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞরা হৃদরোগের জন্য চর্বি এবং কোলেস্টেরলকেই বরং দায়ী করেন। যে সব দেশে চিনি খাওয়ার হার বেশি সেখানে হৃদরোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। অবশ্য ঐ একই দেশগুলোতে চর্বি খাওয়ার রীতিও বেশি। তাই নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

চিনির বিরুদ্ধে আনীত সবগুলো অভিযোগ আদালতে প্রমাণিত না হলেও এ যে একজন দাগী আসামী তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই তুলনায় এটা উপকার এমন কিছু করে না। এমন কিছুর জন্য সরাসরি চিনির প্রয়োজন নেই যা আমরা অন্যান্য সাধারণ খাবার থেকে আরো ভালভাবে, নিরাপদভাবে পেতে পারি না। উৎসবে, আনন্দে একটুখানি মিষ্টি মুখ—অবশ্য সে কথা আলাদা।





পুরানো নিদর্শন থেকে ইতিহাস

হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে মানুষ আসে, মানুষ যায়। সময়ের সঙ্গে হয়ত হারিয়ে যায় মানুষের আবাস তার বেশির ভাগ স্মৃতি চিহ্ন। কিন্তু কেউ যেখানে বাস করেছে, সে চলে যাবার পরও কোন না কোনভাবে তার চিহ্ন রেখে যায়। সে চিহ্ন এমনিতে হয়তো কারো নজরে পড়ে না। পড়লেও কেউ এগুলো নিয়ে কিছু ভাবে না। কিন্তু শত শত বছর, এমনকি হাজার হাজার বছর পর বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞরা হয়তো এ সব চিহ্ন খুঁজে বের করেন। সব চিহ্ন তখন অক্ষত থাকে না। কিন্তু যেটুকু থাকে সেখান থেকে তাঁরা বহু কৌশলে জানার চেষ্টা করেন ঐ পুরানো দিনের মানুষগুলোর কথা। এভাবে জানা হয় পুরানো দিনের ইতিহাস।

ঐ সব চিহ্ন বলে দেয় কেমন ছিল ঐ সব মানুষের ঘর-বাড়ি, খাবার-দাবার, জীবনযাত্রা। তাদের জীবনে কি ধরনের বড় ঘটনা, দুর্ঘটনা ঘটেছিল, কেমন গ্রাম বা শহর ওখানে তারা গড়ে তুলেছিল, কিভাবেই বা তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। এ সব নানা কথা জানার একটি সুরাহা করে দেয় আবিষ্কৃত ঐ নিদর্শনগুলো। অবশ্য কিছু কিছু কথা আন্দাজ করে নিতে হয়। কিন্তু সেই আন্দাজের পেছনে থাকে ভাল যুক্তি-প্রমাণ। অল্প কিছু পুরানো চিহ্ন থেকে যে পরিমাণ তথ্য এভাবে জানা যেতে পারে তা বিস্ময়কর। আর এ কাজ করার যে বিদ্যা তাকে বলা হয় প্রত্নতত্ত্ব বা পুরাতত্ত্ব। যাঁরা এর চর্চা করেন, তাঁরা হলেন পুরাতত্ত্ববিদ।

কি সব চিহ্ন যেগুলো নিয়ে কাজ করতে পারেন পুরাতত্ত্ববিদরা? এ চিহ্ন পুরানো দালান কোঠা বা কবর হতে পারে, হতে পারে সে সময়ের আঁকা ছবি কিংবা গড়া মূর্তি। সেদিনের মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদিও হতে পারে। তারা গেরস্থালিতে ব্যবহার করেছে এমন পাত্র, তৈজস এ সব যেমন হতে পারে, তেমনি হতে পারে তাদের কোন মুদ্রা, পোশাক পরিচ্ছদ, অলংকার ইত্যাদি। তাদের কিংবা তাদের

পোষা প্রাণির বা তারা খেয়েছে এমন কোন প্রাণির কংকাল, হাড় ইত্যাদিও পুরাতত্ত্বের চমৎকার নিদর্শন হতে পারে।

আজ থেকে হাজার পাঁচেক বছর আগে দুনিয়ার কোথাও লেখন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি। কাজেই এর আগের মানুষের সম্বন্ধে কোন কথা লিখিত বিবরণীর মাধ্যমে জানা সম্ভব নয়। একমাত্র পুরাতত্ত্বের নিদর্শন থেকেই তাদের ইতিহাস জানা যায়। তবে পুরাতত্ত্ব মাত্রই পাঁচ হাজার বছর আগের বিষয় হতে হবে এমন কোন কথা নেই। লিখিত বিবরণী থাক বা না থাক, এ সব নিদর্শন ইতিহাসের জানাকে আরো অনেক সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারে। এমনকি মাত্র পঞ্চাশ কি একশ' বছর আগের কথাও আমাদের কাছে এ সব নিদর্শনের মাধ্যমে অনেক বেশি জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে।

আসলে পুরাতত্ত্ববিদরা শুধু হারানো দিনের নিদর্শনই খোঁজেন না। একই সঙ্গে তাঁরা আরো কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। তাঁদের সব সাক্ষ্য-প্রমাণকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

এগুলো হল—১. সচল নিদর্শন ২. অচল নিদর্শন ৩. প্রাকৃতিক পরিবেশ-চিহ্ন। মুদ্রা, ঘটি-বাটি, হাতিয়ার ইত্যাদি যে সব জিনিস সেই দিনের মানুষ বানিয়েছে, ব্যবহার করেছে, সেগুলো সচল নিদর্শন। এগুলো নষ্ট না করে সরিয়ে নিয়ে যায় প্রাপ্তিস্থান থেকে। অচল নিদর্শনগুলো এভাবে সরানো যায় না—যেমন দালান-কোঠা, রাস্তা, নালা, খাল, কবর ইত্যাদি। প্রাকৃতিক পরিবেশ-চিহ্ন হল যেখানে যে অবস্থায় নিদর্শনগুলো পাওয়া গেছে তার আশেপাশে মাটি, পাথর, প্রাণির হাড়, প্রাচীন গাছ ইত্যাদি প্রাকৃতিক নমুনা। এগুলো থেকে বোঝা যায় সেদিনের মানুষ এ সব প্রাকৃতিক জিনিসকে কিভাবে ব্যবহার করেছে। তা ছাড়া নিদর্শনের বয়স বুঝতেও সুবিধা হয় এতে।

পুরাতত্ত্ববিদের প্রথম কাজ হল পুরানো নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে যেখানে সে রকম জায়গা সুনির্দিষ্ট করা। এ রকম পুরো এলাকাটিই অনেক গুরুত্ব বহন করে। কারণ দু'একটা নিদর্শন পাওয়াটাই বড় কথা নয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ চিহ্ন ও অঞ্চল নিদর্শনের পটভূমিতে সচল নিদর্শনগুলো কিভাবে কোথায় পাওয়া গিয়েছে তার সার্বিক তথ্যগুলো যথাসম্ভব জানা দরকার। নিদর্শন যদি মাটি খুঁড়ে পাওয়া যায় তা হলে সেখানকার মাটির স্তরগুলো সম্বন্ধে জানতে হয়। মাটির উপরে যদি দালান কোঠা বা অন্য কোন ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার দেখা যায় তা হলে জায়গা সুনির্দিষ্ট করা সহজ হয়। ঐ এলাকায় মাটি খুঁড়ে তখন আরো নিদর্শন পাওয়া যায়। আমাদের দেশে পাহাড়পুর, মহাস্থান গড় বা ময়নামতিতে এভাবেই আবিষ্কৃত হয়েছে বহু বছর আগের অনেক নিদর্শন। এ সব অঞ্চলে এখনো নতুন নতুন খননের মাধ্যমে আরো নিদর্শন থেকে উদ্ঘাটিত হচ্ছে আরো ইতিহাস। কোন কোন পুরাতাত্ত্বিক স্থান আবিষ্কৃত হয়েছে দৈবক্রমে। যেমন ১৯৪০ সালে ফ্রান্সে চারটি শিশু তাদের কুকুরের খোঁজ করতে গিয়ে ঢুকে পড়েছিল এক গুহায়। এভাবে সেখানে প্রাচীন মানুষের আঁকা দেয়ালচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। আবার অনেক মূল্যবান আবিষ্কারের পেছনে রয়েছে পুরাতত্ত্ববিদদের বহু বছরের অক্লান্ত সাধনা।

যেখানে আবিষ্কার ঘটনাচক্রে হঠাৎ করে ঘটে না, সেখানে পুরাতত্ত্ববিদ কিভাবে খোঁজেন একে? এ জন্য বহুকাল ধরে যে পদ্ধতি অনুসণ করা হয় তা হল সম্ভাব্য

জায়গাগুলো তন্ন তন্ন করে খোঁজা। খুব শৃঙ্খলার সঙ্গে এ কাজ করতে হয়, যাতে কোন কিছু দৃষ্টি এড়িয়ে না যেতে পারে। মাটির নিচে কোথায় নিদর্শন পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তা আন্দাজ করার জন্য কিছু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্য নেয়া যায়। যেমন বিমান থেকে তোলা ছবিতে যদি দেখা যায় যে কোথাও গাছপালার প্রকৃতি হঠাৎ করে বদলে গেছে—সেখানে কোন কিছু থাকতে পারে। পুরানো সেচ খালের কাছে বা বড় কবরখানার কাছে গাছপালার উচ্চতা বেশি হতে পারে। অথবা চাপাপড়া পুরানো বাড়ির বা রাস্তার ধ্বংসাবশেষের উপর অগভীর মাটির গাছপালা অপেক্ষাকৃত ছোট হতে পারে। উপর থেকে ধাতু উদ্‌ঘাটক যন্ত্রের সাহায্যে জানা যেতে পারে মাটির ভেতর ৬ ফুট পর্যন্ত গভীরে কোন বড় ধাতব নিদর্শন আছে কিনা।

পুরাতাত্ত্বিক স্থান নির্দিষ্ট করার পর বিশেষজ্ঞরা এর উপর কাজ আরম্ভ করেন। প্রথমে তৈরি করে ফেলতে হয় পুরো জায়গার একটি মানচিত্র বা নকশা। পুরো এলাকাটি হয়তো বেশ কয়েকটি বর্গক্ষেত্রে ভাগ করে ফেলা হয়। তারপর এর এক একটির উপর সন্ধান চালানো হয় নিদর্শনের জন্য। মাটির উপরে যে সব নিদর্শন পাওয়া যায় তা ঠিক কোন জায়গায় পাওয়া গেল তা মানচিত্রে চিহ্নিত করা হয়।

এর পর খোঁজা হয় মাটির ভেতরে রয়েছে যে সব নিদর্শন। এর জন্য খনন করতে হয়। কি ধরনের নিদর্শন আশা করা হচ্ছে তার উপরেই নির্ভর করবে খননের প্রকৃতি। তা ছাড়া ওখানকার ভূমির অবস্থা, আবহাওয়া—এ সবের উপরও নির্ভর করবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরাতত্ত্ববিদকে খনন করতে হয়, মাটি সরাতে হয় অতি সাবধানে অল্প অল্প করে—যাতে কোন নিদর্শন দৃষ্টি না এড়াতে পারে, নষ্ট না হতে পারে। এমনকি সূক্ষ্ম ছাকনি দিয়ে মাটি ছেঁকেও দেখা হতে পারে ছোট্ট কোন নিদর্শনের খোঁজে। খননের ফলে যেমন উদ্ঘাটিত হতে পারে দালানের ভিত্তি, দেয়াল, মন্দিরের চত্বরে এমনি বড় কোন অচল নিদর্শন অথবা ছোট বড় নানা সচল নিদর্শন কিংবা শস্য দানার মত ক্ষুদ্র কোন জিনিস।

পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন শুধু মাটির উপরে বা ভেতরে থাকবে এমন কোন কথা নেই। এটি পানির তলায়ও থাকতে পারে। অতীতে ডুবে গেছে এমন জাহাজ যেমন এটি হতে পারে, তেমনি কালে কালে সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়েছে এমন কোন নগর-বন্দরের জায়গায়ও চলতে পারে অনুসন্ধান। বিমান থেকে ফটোগ্রাফি, শব্দ তরঙ্গ দিয়ে অনুসন্ধান, ডুবুরী নামিয়ে অনুসন্ধান ইত্যাদি নানা রকম পদ্ধতি এর জন্য অনুসরণ করা হয়।

পুরাতত্ত্বের নিদর্শন কোথায় কিভাবে পাওয়া গেল তা সূক্ষ্মভাবে লিপিবদ্ধ করতে হয়। এ জন্য বর্ণনা লেখা, মানচিত্রে চিহ্নিত করা, গুণে রাখা, ফটো তুলে রাখা ইত্যাদি সব কৌশল অবলম্বন করতে হয়। যেমন প্রায়ই পুরাতাত্ত্বিক স্থান থেকে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় ঘটি বাটির ভাঙা টুকরা। এক একটি ছোট জায়গা থেকে পাওয়া এমনি টুকরা আলাদা থলেতে ভরে ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে এগুলো খুব যত্ন করে পরিষ্কার করে প্রত্যেক টুকরায় চিহ্নিত করা হয়। পরে কোন টুকরা অন্য কোনটির সঙ্গে লাগবে—এদের জুড়ে পুরা পাত্রটি গড়ে তোলা যায় কিনা ইত্যাদি দেখার জন্য এ সব সাবধানতা প্রয়োজন।

ধাতব বা কাঠের তৈরি নিদর্শনগুলোর জন্য ল্যাবরেটরিতে আরো বেশি যত্নের প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, লোহার উপর থেকে মরিচা এমনভাবে সরাতে হবে যেন এর গায়ের ক্ষতি না হয়। ভেজা অবস্থায় যে কাঠ ভাল ছিল হঠাৎ শুকিয়ে গেলে তা বেঁকে বিকৃত হয়ে যেতে পারে। সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারার আগ পর্যন্ত একে সব সময় ভিজিয়েই রাখতে হয়।

পুরাতত্ত্ববিদদের বড় কাজ—পাওয়া নিদর্শনগুলো ব্যাখ্যা করা। এই ব্যাখ্যার থেকেই উদ্‌ঘাটিত হব ইতিহাস। এ কাজের তিনটি পর্যায় থাকতে পারে—১. শ্রেণী বিভক্তি ২. বয়স নির্ণয় ৩. মূল্যায়ন।

পাশাপাশি জায়গায় পাওয়া নিদর্শনগুলোর মধ্যে এবং একই জায়গায় পাওয়া বিভিন্ন সময়ের নিদর্শনগুলোর মধ্যে সুশৃঙ্খল কিছু সম্পর্ক বের করতে না পারলে এদের ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়। এ জন্য একই রকম নিদর্শনগুলোকে এক একটি শ্রেণীভুক্ত করা প্রয়োজন। এক রকম মানে এরা দেখতে একরকম হতে পারে, একইভাবে তৈরি হতে পারে অথবা একই কাজে ব্যবহৃত হয়েছে তাও হতে পারে। আবার একই শ্রেণীভুক্ত নিদর্শনগুলোকে পর পর বিভিন্ন স্টাইল বা এমনি কিছু অনুসারে সাজিয়ে দেখা যেতে পারে। এভাবে শ্রেণীভুক্ত আর সাজিয়ে নেবার পর সাধারণ কিছু নিদর্শন থেকে ঐতিহাসিক ক্রমে কিছু তথ্য ভেসে আসতে পারে। যেমন মেক্সিকোর প্রাচীন এক পুরাতাত্ত্বিক স্থানে পাওয়া বহু ঘটি বাটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিন খুঁটির উপর বসানো বেলনাকার পাত্র ব্যবহৃত হতো। এর আগে খ্রিস্ট জন্মের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত ছিল সরল বাটির মত পাত্র, আরো হাজার খানেক বছর আগে পর্যন্ত কিনারাওয়ালা বাটি, এর আগের এক হাজার বছরে চেপ্টা গোলাকার বাটি, তারও আগে লম্বাটে গোলাকার বাটি। এর থেকে যুগে যুগে মাটির নির্মাণ কৌশল, রুচি, অভ্যাস ইত্যাদির পরিবর্তনগুলো বোঝা যায়। অবশ্য এর জন্য আরেকটি জরুরি কাজ হল নিদর্শনগুলোর বয়স নির্ণয় করা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে বয়স নির্ণয়ের সহজ পদ্ধতি হল জানা অন্য কিছুর সঙ্গে বয়স মিলিয়ে নেয়া। যেমন পুরানো গাছের গুড়িতে যে গোল গোল রেখা থাকে তার প্রত্যেকটি গাছটির এক এক বছর বয়স নির্দেশ করে। কাজেই কাঠের তৈরি কোন নিদর্শনের এই রেখাগুলি একই এলাকার গাছের গুড়ির রেখার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে অনেক সময় তার বয়স পাওয়া যেতে পারে। ভূতত্ত্ববিদরা মাটির কোন স্তর কখন তৈরি হয়েছে তা বলে দিতে পারেন। ঐ স্তরে পাওয়া নিদর্শনের বয়সও এর কাছাকাছি হবে তা আন্দাজ করা যেতে পারে। অনেক সময় ঘটি বাটি বা হাতিয়ারের ধরন দেখেই বয়স আন্দাজ করা যায়।

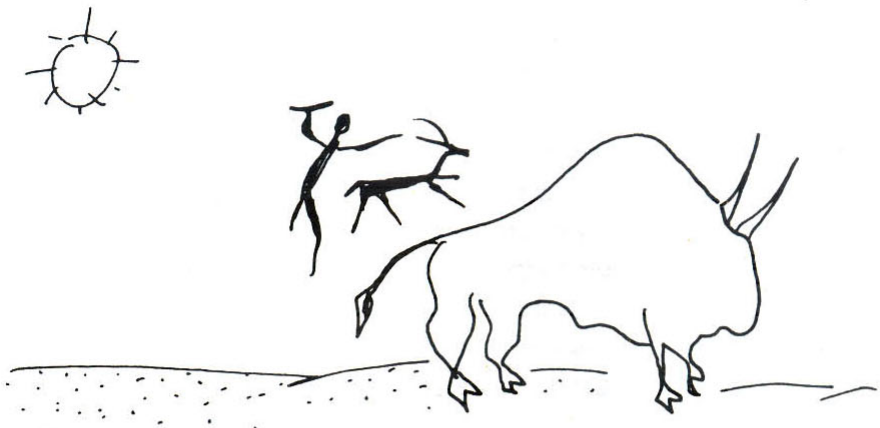
বয়স আরো সঠিকভাবে নির্ণয় করতে চাইলে নিদর্শনগুলোর কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে সেটি সম্ভব হয়। এভাবে কার্বন ডেটিং নামক পদ্ধতিতে নিদর্শনের একটুখানি মাত্র অংশ পরীক্ষা করে ৫০-৬০ হাজার বছর পুরানো জিনিসের বয়সও নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা যায়। সম্প্রতি আরো কিছু পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে যাতে ১৫-২০ লক্ষ বছর পর্যন্ত পুরানো নিদর্শনের বয়স নির্ণয় করা যায়।

অনেক সময়, নানা যুক্তি প্রমাণ-পরীক্ষার সাহায্যে মূল্যায়ন করার পরই স্থির করা যায় নিদর্শনটি কখন, কি কাজে তৈরি ও ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন মধ্য আমেরিকার মায়া সভ্যতায় দালানে মাটির নিচে কুঠুরি থাকতো। কিছু পুরাতত্ত্ববিদ মনে করেন তারা ভবিষ্যতে খাওয়ার জন্য খাদ্য জমিয়ে রাখতে এই কুঠুরি ব্যবহার করতো। এটি প্রমাণ করার জন্য এক বছর এতে সত্যি বাদাম রেখে দেখা হয়েছে তা কেমন থাকে। বাড়িঘরের আকার থেকে আন্দাজ করা যায় এক বাড়িতে কতজন লোক থাকতো। সে যুগের অনেক মানুষ কবরে মৃতের সঙ্গে নানা জিনিস দিয়ে দিত। এগুলো থেকে অনুমান করা যায় যাদের কবর তাদের সামাজিক মর্যাদা কি রকম ছিল।

নিদর্শনের সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশ-চিহ্ন থেকেও অনেক কিছু মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এখনকার মানুষ কি ক্ষেত, কি চাষবাস করতো তা এভাবে বোঝা যায়। এমনকি মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত কিভাবে হয়েছে তাও বোঝা যেতে পারে। স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন হতো না এমন কোন শস্য বীজ পেলে বোঝা যায় যে এর খাদ্যাভ্যাস অন্য জায়গা থেকে কেমন করে এলো। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞরা এ রকম মূল্যায়নে সহায়তা দিতে পারেন। তেমনি সহায়তা দিতে পারেন সমাজ বিজ্ঞানীরা এবং ঐতিহাসিকরা।

তুমি একজন পুরাতত্ত্ববিদ নও বলে এ ব্যাপারে তোমার কিছু করার নেই তা কিন্তু ঠিক নয়। বিষয়টির প্রতি তোমার উৎসাহ ও আগ্রহ তোমাকেও গড়ে তুলতে পারে একজন সৌখিন পুরাতত্ত্ববিদ হিসেবে। যে গ্রামে বা শহরে তুমি থাক সেখানেই হয়তো রয়েছে এমন কিছু জিনিস যার পুরাতাত্ত্বিক মূল্য রয়েছে। পুরানো দালান, মসজিদ, মন্দির, মূর্তি, পুকুর ঘাট ইত্যাদি ভাল করে দেখলে, এদের সম্বন্ধে যা জানা আছে তা শুনলে ওসব জায়গায় অনেক কিছু হয়তো তোমারই নজরে পড়তে পারে। দেখবে যতই জানবে ততই তুমি কি রকম আনন্দ পাচ্ছ এই ইতিহাস চর্চা থেকে।

শুধু বাইরের নিদর্শনই কেন, তোমাদের বাড়িতেই হয়তো দেখবে তোমার দাদার, নানার বা তাঁদের বাবা মায়ের আমলের কিছু জিনিস রয়ে গেছে। তখনকার কোন বাক্স, ডেগচি-পাতিল, আসবাব, তৈজস, পোশাক, মুদ্রা, এমনি কোন কিছু। তাছাড়া হয়তো তখন তাঁরা ব্যবহার করেছেন এমন কোন যন্ত্রপাতি পেয়ে যাবে। তোমার নানার বাবা যখন যুবক তখন শখ করে যে কলের গানটি কিনেছিলেন সেটি হয়তো তোমার কোন আত্মীয়ের বাসায় বিকল হয়ে এখনো পড়ে আছে। এ সব জিনিসও কিন্তু সামান্য নয়। এও এক ধরনের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন—যদিও অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি সময়ের। এদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর করে, নিজে খুঁটিয়ে দেখে, অন্যদের পরামর্শ নিয়ে তুমি যতখানি পুরাতত্ত্ব চর্চা করতে পারবে তার মূল্যও অনেক এবং তা যে শুধু তোমার নিজের জন্যই মূল্যবান হবে তাই নয়, হয়তো আমাদের সমাজের নিকট অতীতের ইতিহাস উদ্‌ঘাটনে সেটি অবদান রাখবে।



কেমন করে জানলাম

অতীতে বহুদিন আগে পৃথিবীতে যে প্রাণী ও উদ্ভিদ বাস করতো আমরা আজ তাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানি। কিন্তু কেমন করে? ওদের অনেকগুলো সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে, সেও আজ অনেক দিনের কথা। বিজ্ঞানীরা এদের সম্বন্ধে জেনেছেন তাদের ফসিল থেকে। মাটির গভীরে শিলা স্তরে যে ছাপ তারা রেখে গেছে সে সব আবিষ্কার করে। আবার সে আমলের শিরিষ আঠার ভেতর আটকে পড়েছিল নানা পোকা মাকড়। সেই আঠা এই লক্ষ লক্ষ বছরে পরিণত হয়েছে রত্ন পাথর হিসেবে ব্যবহৃত এম্বারে। কিন্তু তার অনচ্ছ ভেতরে হুবহু দেখা যাচ্ছে লক্ষ বছরের পুরানো সেই পোকাকে।

আমাদের নিজেদের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধেও আমরা অনেক কিছু জেনেছি। আমরা জানি মানুষের যে পূর্ব পুরুষ ৫ কি ৬ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে বাস করতো, যাদের আমরা তখন নাম দিয়েছি পিথেক্যানথ্রোপাস—তাদের গড় দৈর্ঘ্য ছিল ১৭০ সেন্টিমিটার, আর মাথার খুলির আয়তন ছিল ৯০০ ঘন সেন্টিমিটার। অথচ এখন থেকে ১ লক্ষ বছর আগে যে মানুষ বাস করত তার দৈর্ঘ্যে কম হলেও (১৫০-১৬০ সেন্টিমিটার) তাদের মস্তিষ্ক ছিল বড়, কারণ মাথার খুলির আয়তন ছিল ১২০০ ঘন সেন্টিমিটার। এদের এখন আমরা বলি সিনান থ্রোপাস।

শুধু পুরানো মানুষের কংকাল আবিষ্কার করেই আমরা পূর্ব পুরুষদের সম্বন্ধে জানিনি। তারা যে সব জিনিসপত্র ব্যবহার করতো তার যে সব নমুনা মাটির ভেতর মাঝে মাঝে পাওয়া গেছে তারাও অনেক কাহিনী বলে। তাদের অস্ত্র—পাথরের তৈরি কুড়াল, ছুরি; অলংকার গলার মালা, হাতে চুরি ইত্যাদি এমনিভাবে প্রাপ্ত জিনিস। নৃতত্ত্ববিদরা এখন কংকাল থেকে বাইরের রূপদানের কৌশলও জানেন। তাই আমরা তখন মোটামুটি চাক্ষুষ ধারণা করতে পারি লক্ষ বছর আগের নিয়ানডেরথাল মানুষ দেখতে কেমন ছিল, কিংবা ৪০ হাজার বছর আগের ক্রোম্যাগনন মানুষ।

ভাল, ওরা দেখতে কেমন ছিল, কি ব্যবহার করতো তা না হয় জানা গেল। কিন্তু ওরা কি ভাবতো তা বুঝবো কেমন করে? তাদের যে আচার, আচরণ, উৎসব, বিশ্বাস ইত্যাদি ছিল সে কি আমরা জানতে পারি? ওরা তো এ সব নিয়ে কোন বই লিখে যায়নি আমাদের জন্য। অবশ্য ব্যবহার্য জিনিস দেখে কিছুটা আঁচ করা সম্ভব; যেমন কারা শিকার করতো, কেমন করে করতো ইত্যাদি। কিন্তু শিকারের সময় তারা কি ভাবতো তা জানবো কি করে। বিজ্ঞানীরা ভাবতেন এ আর কোন দিন জানা যাবে না।—কিন্তু একদিন ... ঊনবিংশ শতাব্দীর এক দিন স্পেন দেশের এক আইনজীবী এবং সৌখিন প্রত্নতত্ত্ববিদ একটি গুহা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। ওর ভেতর তিনি প্রচীন মানুষের বেশ কিছু হাড়, পাথরের অস্ত্র ইত্যাদি পেয়েছিলেন। এ সব যেহেতু গুহাটির মেঝেতেই ছিল, সাউতুলা নামে এই বিজ্ঞানীর দৃষ্টি ছিল ওদিকেই। সাথে ছিল তাঁর ছোট্ট মেয়ে। মাটির দিকে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে থাকা বাবার কাণ্ড দেখে মেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। তাই সে এদিক, ওদিক, উপরের দিক ইত্যাদি দিকে তাকানো শুরু করছিল বিরক্তি ভরে। হঠাৎ চেচিয়ে উঠে বললো—

'বাবা দেখ দেখ, ষাঁড়'!

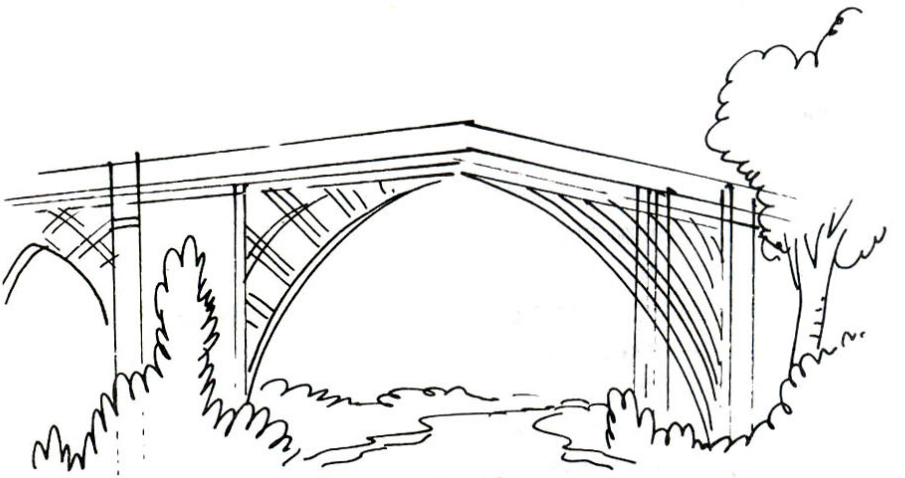
'ষাঁড়? কিসের ষাঁড়, কোথায় ষাঁড়'

'ঐ যে উপরে।'

বাবা মাথা তুলে দেখলেন সত্যিই তাই। গুহার ছাদে আঁকা রয়েছে অনেক ক'টা জীব জন্তুর ছবি—ছাগল, বন্য ঘোড়া, ষাঁড়, বাইসন; সবই প্রায় সত্যিকার আয়তনের। রঙিন জলজ্যান্ত এই ছবিগুলো যে সত্যি সত্যি প্রাচীন মানুষের আঁকা হতে পারে বিজ্ঞানীরা তা প্রথমে বিশ্বাসই করেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্পেনের আল্‌টামিরা পাহাড়ে দৈবাৎ আবিষ্কৃত এই ছবিগুলোই তাদের চোখ খুলে দিল।

পরে এ রকম আরো অনেক ছবি পাওয়া গেল। সেগুলো প্রাচীন মানুষদের চিন্তা ভাবনা, তাদের দক্ষতা সম্বন্ধে এমন অনেক কাহিনী জানালো যা আগে জানা সম্ভব হতো না। আবিষ্কৃত হল এসব ছবির নানা বৈশিষ্ট্য। জানা গেল আদিম শিকারীরা নানা তুকতাকে বিশ্বাস করতো, আজকের দিনেও যেমন করে অনেক মানুষ। তাদের ভয়, তাদের আনন্দ এ সবেরও কিছু কিছু জানা গেল। বোঝা গেল এরা যাদু মন্ত্রে বিশ্বাস করতো। কিছু কিছু ছবি থেকে জানা গেল আদিম মানুষ জীব জন্তুকে শুধু শিকারই করতো না তাদের পূজাও করতো। তাদের এক অদ্ভুত বিশ্বাস ছিল যে জীব জন্তুর ছবি আর আসল জন্তুর মধ্যে কোন তফাৎ নেই; কোন জন্তুকে এঁকে তার ছবির উপর মেরে ফেললে—আসলটিকেও মারা সহজ হয়ে পড়বে।

কাজেই বুঝতে পারছ প্রাচীন কালের কথা মানুষকে নানা রকম সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে জানতে হয়েছে বহু বুদ্ধি খাটিয়ে। কিন্তু বিজ্ঞানের কৌশল খাটিয়ে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এসব পুরাতাত্ত্বিক ইতিহাস। জানতে পেরেছে সেদিনের মানুষ কি রকম দেখতে ছিল, তারা কি করত, এমনকি তারা কি ভাবত।



আয়রন ব্রিজ : শিল্প বিপ্লবের আতুড় ঘর

শিল্প বিপ্লব এমন জিনিস নয় যার একটি জন্ম তারিখ বা জন্মস্থান সুনির্দিষ্ট করা যায়। তবুও একে কখনো কোথাও থেকে শুরু হতে হয়েছিল, সেই প্রাথমিক ঘটনাগুলো ঘটতে হয়েছিল যার ফলে বৈপ্লবিকভাবে বদলে গিয়েছিল পাশ্চাত্যে উৎপাদনের প্রক্রিয়া, অর্থনৈতিক কাঠামো এবং মানুষের জীবনযাত্রা। শিল্প বিপ্লবের সেই আতুড় ঘরটিকে যদি খুঁজে পেতেই হয় তা হলে তার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্রার্থী হবে ইংল্যান্ডের শ্রপশায়ার উপত্যাকায় আয়রন ব্রিজ এলাকাটি। এখানে মাত্র ছয় বর্গমাইল এলাকার মধ্যেই আজও খুঁজে পাওয়া যাবে শিল্প বিপ্লবের প্রথম দিনগুলোর স্মৃতি বহনকারী অনেক নমুনা।

এখানে সবকিছুর মধ্যমণি হচ্ছে পৃথিবীর সর্বপ্রথম লৌহ নির্মিত সেতু আয়রন ব্রিজ। সেভার্ন নদীর উপর এই সেতুটির নামেই এখানকার ক্ষুদ্র শহরটির নামকরণ হয়েছে। প্রথম লোহার সেতুটি ছাড়াও এখানে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে সেই ব্যবস্থাসমূহ যেখানে ঢালাই হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম লোহার সিলিন্ডার যাতে করে শিল্পে লাভজনকভাবে বাষ্পীয় শক্তির ব্যবহার সম্ভব হয়; যেখানে তৈরি হয়েছিল প্রথম লোহার রেলপথ, বাষ্পীয় রেল ইঞ্জিন, ভাসানো হয়েছিল প্রথম লোহার তৈরি বার্জ।

এই আতুড় ঘরের সবচেয়ে বড় অনুভূতি জাগে নিকটস্থ কোল-ব্রুকডেলের টিলার উপর পুরানো কবরখানায় গেল। এখানেই শায়িত আছেন সেই ওস্তাদ কারিগরদের অনেকে যাঁরা কয়েক পুরুষ ধরে তাঁদের বৈপ্লবিক কুশলতা যোগ করে করে বিশ্বের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিলেন। কবরের ফলকগুলোতে যে নামটি বার বার দেখা যায় তা হল—ডার্বি। এখান থেকে নেমে এলে কাছেই পুরানো কোলব্রুকডেল কোম্পানির আদি চুল্লী যেখানে প্রথম আব্রাহাম ডার্বি সবকিছু শুরু করেছিলেন। ১৭০৮ সালে ব্রিস্টল থেকে এখানে এসে তিনি চুল্লীটি লীজ নিয়েছিলেন। এর আগে কাঠ কয়লা জ্বালানো হতো এখানে। কাঠকয়লার আগুনে যেটুকু লোহা হতো

তাতে বড় কাজ কিছু সম্ভব ছিল না। ডার্বি উদ্ভাবন করেছিলেন যুগান্তকারী নতুন পদ্ধতি যাতে নিকটবর্তী কয়লা খনি থেকে কোক কয়লার ব্যবহার সম্ভব হল। লৌহশিল্পের চেহারাটাই রাতারাতি পাল্টে গেল—বড় মাপের উৎপাদন সম্ভব হল।

ডার্বির সেই চুল্লীতে হাওয়ার ঝাপটা দেওয়া হতো বিশাল জল চাকার দ্বারা চালিত চামড়ার হাপর দিয়ে। চুল্লীটি রয়েছে লাল ইটের তৈরি জবরদস্ত গাঁথুনির ভেতর—যাতে এটি প্রচণ্ড উত্তাপ সইতে পারে। হামাগুড়ি দিয়ে এর অভ্যন্তরে ক্রমশ সরু বর্তুলাকার প্রকোষ্ঠে ঢোকা যায়। এখানে হাত প্রসারিত করলে দু'দিকে দেয়াল স্পর্শ করা যায়, অনুভব করা যায় যেন আগ্নেয়গিরির শীতল লাভার মত শিলা। এই আদি অগ্নিগর্ভ থেকেই যেন জন্ম লাভ করেছে, উৎক্ষিপ্ত হয়েছে আজকের শিল্পায়িত পৃথিবীটি! পুরানো চুল্লীর কাছাকাছি একটা বাড়িতে বহু নমুনা রাখা আছে যেগুলো ২৬০ বছর ধরে কোম্পানি লোহা ঢালাই করে তৈরি করেছে। গার্হস্থ্য সরঞ্জাম থেকে লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির চিত্রকর্ম লাস্ট সাপারের' রিলিফ প্রতিচ্ছবি সবই আছে। এই কোলব্রুকডেল পদ্ধতি ব্যবহার করেই সেদিন পৃথিবীর অন্যতম আদি লৌহ কাঠামোর দালানও তৈরি হয়েছিল। শ্রুসবুরীর কাছে এই দালানটি এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রথম দিকের শিল্পে ব্যবহৃত বাষ্পীয় ইঞ্জিনগুলো ছিল পিতলের তৈরি। এর এক একটিতে খরচ পড়তো হাজার পাউন্ডের উপর। দ্বিতীয় আব্রাহাম ডার্বি আড়াইশ পাউন্ডেরও কম খরচে লোহার ইঞ্জিন তৈরি করলেন। বাষ্পীয় শক্তির বাস্তব ব্যবহারে একটি বিরাট উৎসাহ এলো এর থেকে। আর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এটি রেলওয়ে ইঞ্জিনও সম্ভবপর করলো।

১৭৭৭ সালে তৃতীয় আব্রাহাম ডার্বি আয়রন ব্রিজের অংশগুলো ঢালাইয়ের কাজে হাত দেন। মোট ৩৭৫ টন লৌহ নির্মিত অংশ দড়ি আর চেইনে ঝুলিয়ে সংস্থাপিত করতে হয়েছিল এই সেতুর নির্মাণে—১০০ ফুট দীর্ঘ এই অর্ধবৃত্তাকার সেতু। পুরো নির্মাণ কাজে একটি বারও ব্যস্ত নৌ চলাচলকে ব্যাহত করতে হয়নি। ১৭৮১ সালের মধ্যে সেতুর ২৪ ফুট চওড়া রাস্তাটি সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। সেদিন অনেকের কাছে সেটি ছিল পৃথিবীর অত্যাশ্চর্যের একটি।

শিল্প বিপ্লবের এই আতুড় ঘর থেকে এটি ছড়িয়ে পড়তে বেশি দেরি হয়নি। আজ বহুদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ শিল্পের কেন্দ্র হচ্ছে পেনসিলভেনিয়া। এখানে প্রথম লৌহ নিষ্কাশন করা হয়েছিল ১৭২০ সালে—প্রথম আব্রাহাম ডার্বির এক শ্যালকের সহায়তায়।

আয়রন ব্রিজের কাছে কোলপোর্ট গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি সুড়ঙ্গপথ। ২০০ বছর পুরানো ইটের খিলানে তৈরি এই সুড়ঙ্গ ৬ ফুট উঁচু, ১০০০ গজ দীর্ঘ। পাহাড়ের তল দিয়ে এটি তৈরি করা হয়েছিল খনি থেকে কয়লা আনতে। কিছু সেখানে পাওয়া গেল আলকাতরার ঝরণা—প্রতি সপ্তায় ১০০০ গ্যালন পাওয়া যেত। এখনো ইটের ফাঁক থেকে আলকাতরা বেরিয়ে জমতে দেখা যায়।

ঐ আলকাতরা যাতে নৌবাহিনীর কাঠের জাহাজগুলোর তলার সুরক্ষায় ব্যবহার করা যায় সেই চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু কাঠের জাহাজের দিনও ফুরিয়ে এসেছিল আর তারও এই অঞ্চলেরই প্রচেষ্টায়। আয়রন ব্রিজ তৈরিতে তৃতীয় আব্রাহাম ডার্বির একজন

সহকর্মী ছিলেন জন উইলকিন্‌সন। তাঁকে লোকে 'লোহা পাগল' বলতো। অদ্ভুত প্রতিভাবান উদ্ভাবক, প্রকৌশলী এবং লৌহ-কুশলী ছিলেন এই মানুষটি। ১৭৮৭ সালে কোলপোর্টে তিনি প্রথম লোহার বার্জ পানিতে ভাসান। সেই দৃশ্য দেখার জন্য প্রচুর লোক সমাগম হয়েছিল; লোহার পিণ্ডটি কেমন করে টুপ করে ডুবে যায় তাই দেখার জন্য। ভিড়ের মধ্য থেকে একজন তার হাতুড়িটি সেভার্নের পানিতে ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠলো—'এই দেখ কেমন ভাসছে ওটা। উইলকিনসন কিন্তু লোহাকে সেদিন সত্যিই ভাসিয়েছিলেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সমুদ্রগুলোতে লোহাই ভাসছে।

কয়েক বছর আগে সেদিনের আদি লোহার নৌকাগুলোর একটি আবিষ্কৃত হয়েছিল এই অঞ্চল থেকেই। এক কৃষক এটিকে তাঁর গোশালায় পানি সরবরাহের ট্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। এটি এখন আবার নদীতে চলাফেরা করছে।

আব্রাহাম ডার্বিরা কাজ করেছিলেন সে আজ বহুদিন হয়ে গেল। কিন্তু তাঁদের সেদিনের স্মৃতি চিহ্নগুলো যেন মুছে না যায় তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সেভার্ন উপত্যাকার এই অঞ্চলটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং এর শিল্প বিপ্লবের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য একে শিল্প প্রত্নতাত্ত্বিক জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং বিশেষভাবে সংরক্ষিত করা হচ্ছে। সারা দুনিয়া থেকে হাজার হাজার পর্যটক এখানে আসেন শিল্প বিপ্লবের এই আতুড়ঘর দেখার জন্য। এখানে স্থাপন করা হয়েছে 'আয়রন ব্রিজ গর্জ মিউজিয়াম'। আয়রন ব্রিজে ওঠার আগে যানবাহনকে শুল্ক দিয়ে যেতে হতো যে 'টোল হাউজে' সেটিই এখন মিউজিয়াম ট্রাস্টের তথ্যকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কয়েক বছর আগে আয়রন ব্রিজের ভিত্তিতে পাথরের গাঁথুনি নড়ে গেলে ব্রিজটির সুন্দর লোহার কাজগুলো দুমড়ে যাবার একটি আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল। ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে নদীর তলে রি ইনফোর্সড কংক্রীট দিয়ে দুই পারের গাঁথুনিকে স্থায়ীভাবে অনড় থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সেতুর সংরক্ষণেই খরচ হয়েছে মোট দেড় লক্ষ পাউন্ডের মত। অথচ এই সেতু নির্মাণের বাজেট ছিল মাত্র ৩,০০০ পাউন্ড ১১ শিলিং।

আয়রন ব্রিজ অঞ্চলের শিল্প বিপ্লবকালীন ঐতিহ্য ধরে রাখার কাজে ট্রাস্ট প্রচুর স্বেচ্ছাসেবী সহায়তা পাচ্ছে। স্থানীয় লোকজনের মধ্য থেকে ৩৫০ জনের একটি স্বেচ্ছাসেবী দল গড়ে তোলা হয়েছে শিক্ষক, অফিস কর্মচারী, দক্ষ কারিগর, গৃহবধু সব রকমের মানুষ রয়েছেন এতে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা খুব কাজে আসছে এই অঞ্চলের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে। ছুটির দিনগুলোতে ওরা কাজ করছে।

৪২ একর জোড়া এই শিল্প প্রত্নতাত্ত্বিক জাতীয় উদ্যানটি এখন বৃক্ষ সুশোভিত সুন্দর জায়গা, এর প্রবেশ পথের দুপাশে রাখা আছে বিশাল দুটা বীম টাইপের বাষ্পীয় ইঞ্জিন—ডেভিড ও 'স্যাম্পসন'। ১০০ বছর ধরে এগুলো ব্যবহৃত হয়েছিল স্থানীয় লোহার কারখানার হাপর চালিয়ে বাতাসের ঝাপটা দেবার কাজে। এখান থেকে ব্লাস্ট ফারনেসের উপজাত পাথরে মোড়ানো রাস্তা মাইনারস ওয়াক দিয়ে এগোতে এগোতে ইতিহাস সচেতন মানুষ অনায়াসে অনুভব করতে পারেন অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর সেই দিনগুলোতে যখন এই জায়গা থেকেই শোনা যাচ্ছিল নতুন জীবনের পদধ্বনি।



পৃথিবীর ওজন যিনি নিয়েছিলেন

তোমরা সবাই জান প্রায় তিনশ' বছর আগে আইজ্যাক নিউটন সুন্দর একটা নিয়ম আবিষ্কার করেছেন যে নিয়মে বিশ্বের সব বস্তু সব বস্তুকে আকর্ষণ করে। মহাকাশে সূর্য, পৃথিবী, গ্রহ, চাঁদ এ সবের চলাফেরার পথ জানা ছিল মানুষের বহুদিন থেকেই, জানা ছিল এদের গতিও। নিউটনের নিয়ম অনুসারে এদের যে কোন একটির ভর যদি জানা যেত, তা হলে অন্যগুলোর ভর অংক করেই বের করা সম্ভব। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দাবি তুললেন যে পৃথিবীতে আমরা বাস করছি তার ভরটাতো অন্তত জানা চাই। অনেক ভাবতে লাগলেন সমস্যাটা নিয়ে। চাইতো বটে, কিন্তু এই প্রকাণ্ড পৃথিবী—কেমন হবে তার দাড়িপাল্লা!

বিষয়টিকে শেষ পর্যন্ত নিষ্পত্তি করলেন যিনি, তিনি কিন্তু জ্যোতির্বিদ ছিলেন না, ছিলেন রসায়নবিদ। ইংল্যান্ডের হেনরী ক্যাভেন্ডিশ—রসায়নের গবেষণাগারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে মাপাটা তাঁর প্রায় বাতিকে পরিণত হয়েছিল। তাঁর কাছে পৃথিবীর ওজন নেয়া ওরকম একটা মাপার ব্যাপারই ছিল—হলইবা জিনিসটা একটু বড়!

আসলে ক্যাভেন্ডিশ লোকটাই বড় অদ্ভুত ছিলেন। খুব অভিজাত ঘরের লোক, অথচ তাঁর কাপড়-চোপড়ের অবস্থা দেখলে লোকের হাসি আসতো। এক প্রস্থ কাপড়ই এক সময়ে থাকতো তাঁর—সেটা যদ্দিন ক্রমাগত ব্যবহারে ছিড়ে পরার অযোগ্য না হতো তদ্দিন দরজি-বাড়ির মুখো হতেন না। তোমরা হয়তো বলবে ঘরে বৌ ঝি কি কেউ ছিল না যে এসব একটু দেখবে। তা থাকবে কি করে? লোকটা জীবনে বিয়েই করেননি। মেয়েদের তিনি কেন জানি রীতিমতো ভয় করে চলতেন—কারো সাথে কথা বলতে, এমনকি সামনে পড়তেও চাইতেন না। সবার সাথেই সাংঘাতিক লাজুক ছিলেন তিনি, চাকর-বাকরদের সাথেও যেন কথা না বলতে হয় সে জন্য স্লিপ লিখে সব আদেশ-নির্দেশ দিতেন।

আগেই বলেছি ক্যাভেন্ডিশ ছিলেন মূলত রসায়নবিদ। আর রসায়নবিদ হিসেবে তিনি দুনিয়ার সেরা বিজ্ঞানীদের একজন হিসেবে বরাবর গণ্য হয়ে আসছেন। হাইড্রোজেন গ্যাস তাঁরই আবিষ্কার। বায়ুমণ্ডলে আর্গন গ্যাসও তিনি আবিষ্কার করেন। আগে পানিকে একটা মৌলিক পদার্থ মনে করা হতো। তিনিই প্রথম শেখান যে পানি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগ।

তাঁর মাপ জোপের বিষয় হিসেবে ক্যাভেন্ডিশ পৃথিবীর ওজনকে কেন বেছে নিলেন সে কথা আগে বলেছি। যেভাবে তিনি এ কাজে এগোলেন তাও কিন্তু নিউটনের সেই মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের ভিত্তিতেই। এই নিয়মে পৃথিবী যে রকম সব জিনিসকে এবং চাঁদকে তার দিকে টানে—তেমনি দুটি সীসার বলকে পাশাপাশি ঝুলানো হলে তারাও পরস্পরকে টানবে। অবশ্য এই টানটা হবে খুবই অল্প, কারণ সীসার বলগুলোতো আর পৃথিবীর মতো অতো বড় নয়। এই টান মাপা গেলে বলগুলোর ওজন আর টানের মধ্যে যে ধ্রুবকের সম্পর্ক পাওয়া যাবে তার থেকেই পৃথিবীর ওজন জানা সম্ভব।

ক্যাভেন্ডিশের মাপার যন্ত্রটা হল একটা কাঠের দণ্ডের দুই প্রান্তে দুটা ছোট বল, আর এদের মাঝামাঝি দুটা বড় বল লাগিয়ে রাখা আছে। চারটা বল সমেত এই দণ্ডটা ছাদ থেকে সরু একটা সুতা দিয়ে ঝোলানো আছে। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অনুসারে বড় বলগুলো ছোট বলকে নিজের দিকে টানবে—ফলে পুরো দণ্ডটা সামান্য ঘুরে যাবে। এই সামান্য অবশ্য অতি সামান্য, তবুও একে মাপা যাবে। তবে এই মাপ থেকে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে আসতে হলে অনেকগুলো বাড়তি প্রভাবকে আগে হিসাব করে বাদ দিতে হবে। যেমন ঝুলাবার সুতাটার স্থিতিস্থাপকতার প্রশ্ন আসে, ঘরের উত্তাপের প্রশ্ন আসে—ইত্যাদি আরো বহু জিনিস। এগুলো ক্যাভেন্ডিশ অত্যন্ত যত্ন সহকারে বের করলেন। নিখুঁত মাপ পাওয়ার জন্য তিনি চেষ্টা চালিয়ে গেলেন বহুদিন ধরে।

মোট ২৯ বার ক্যাভেন্ডিশ এই একই মাপ নিলেন। তারপর প্রকাশ করলেন ফলাফল। ঐ সীসার বলের টানের থেকে যা পাওয়া গেল তার থেকে পৃথিবীর গড় ঘনত্ব হিসাব করে বের করা যায়। ক্যাভেন্ডিশের পরীক্ষা থেকে সে ঘনত্ব পাওয়া গেল ৫.৪৪৮। অর্থাৎ পৃথিবী যদি শুধু পানিতে তৈরি হয়ে পুরোটা ২৯.২ ডিগ্রি ফারেনহাইট উত্তাপে থাকতো তার যেই ওজন হতো, এর আসল ওজন তার থেকে ৫.৪৪৮ গুণ বেশি। পৃথিবীর ওজন পেতে বিন্দুমাত্র দেরি হল না।

বহু দিন আগের অদ্ভুত স্বভাবের এই লোক, আর অত্যন্ত সফল এই বিজ্ঞান সাধকের কথা কিন্তু আজও বিজ্ঞানের ছাত্ররা ভুলেনি। তোমরা ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা শুনেছ। সেখানকার পদার্থবিদ্যা বিভাগের গবেষণাগারকে বলা হয় ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরী।





মিশরের মমি

দেখার সৌভাগ্য না হলেও মিশরের মমির নাম শুনেছে অনেকেই। সেই হাজার হাজার বছর আগের মৃতদেহ কি অদ্ভুত কৌশলে সংরক্ষণ করা হয়েছে একথা ভাবতেই অবাক লাগে। মিশরে এবং পাশ্চাত্যে বড় বড় মিউজিয়ামগুলোতে এখনো দিব্যি শুয়ে আছে এই মমিগুলো। অনেকগুলোই প্রায় অবিকৃত তরতাজা চেহারার। অনেক অনেক পুরানো দিনকে যেন ওরা এখনো সজীব রেখেছে আজকের পৃথিবীর বাসিন্দাদের জন্য। আসলে মমিগুলোর উদ্দেশ্যও ছিল অনেকটা তাই। মৃত্যুকে যেন ওরা ঠিক মেনে নিতে পারছিল না। তাই জীবনকে না হোক, অন্তত দেহটাকে সংরক্ষণের জন্য এই অদ্ভুত কৌশল।

মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য এই আকুতি কিন্তু মানুষের বরাবর ছিল, ক্ষেত্র বিশেষে এখনো আছে। বাইবেলে জনের গসপেলে বর্ণিত আছে কিভাবে যীশুখ্রিস্টের ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ ক্রুশ থেকে নামিয়ে তাকে পঞ্চাশ সের বৃক্ষ নির্যাস প্রয়োগে অবিকৃত রাখা হয়েছিল। মহাবীর আলেকজান্ডারের মৃতদেহ সংরক্ষণের চেষ্টা হয়েছিল মধুর মধ্যে রেখে আর গত শতাব্দীতে ইংরেজ নৌসেনাপতি লর্ড নেলসনকে ব্রান্ডি মদের মধ্যে! লেনিন ও মাওসেতুং-এর মৃতদেহ একালেও সংরক্ষিত। শীত-গ্রীষ্মের প্রতিটি দিন ভোর থেকে মস্কোর ক্রেমলিন দেয়ালের কাছে শ্রদ্ধাবনত মানুষের দীর্ঘ সারি লেনিনের সংরক্ষিত মৃতদেহ দেখে যান। গত প্রায় পঁচাত্তর বছর ধরেই এ দৃশ্য সেখানে।

প্রাচীন মিশরে অবশ্য কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছিল নিত্য-নৈমিত্তিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মৃতদেহকে মমি করে রাখার। সবচেয়ে প্রাচীন যে মমির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা খ্রিস্টপূর্ব ২,৫০০ অব্দের। তার পরের বিভিন্ন সময়ের বহু মমি আবিষ্কৃত হয়েছে। কেমন দেখতে এই মমিগুলো এখন? একেবারে তরতাজা মানুষের দেহের মতো নয় অবশ্য। সারা দেহ এক ধরনের ব্যাণ্ডেজ ঢাকা, মুখটা খোলা। চামড়া কুঁচকে গেছে, রং কালচে হয়ে গেছে। কিন্তু চেহারার মধ্যে মানবিক ভঙ্গিমাগুলো এখনো স্পষ্ট। কারো

মুখে হাসি, কারো বিস্ময়-দৃষ্টি, কাউকে মনে হয় স্বপ্ন দেখছে। ভয়ে আঁৎকে ওঠার মতো চেহারা বিকৃতি ঘটেনি কোথাও। পুরুষ মমিগুলোর হাত দুটা সাধারণত বুকের উপর ক্রস করা, মহিলা মমির হাত দুপাশে সোজা। বহুদিনের ওপার থেকে সদ্য লোকান্তরিত একজন ব্যক্তির প্রশান্তি যেন বহন করে আনছে এই মমিগুলো।

পুরাতত্ত্বের সাথে মিলিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ রাজন্যের মমিকে চিনতে পারা গেছে। ১৯৭৬ সনে প্রথম এরকম একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজন্যের মৃতদেহ মিশরের বাইরে ভ্রমণ করে; বলা বাহুল্য 'চিকিৎসার' কারণে। রাজা দ্বিতীয় রামসেসের মমি যখন ফ্রান্সে গিয়ে পৌঁছায় তখন তাঁকে এই হাজার বছর পরেও রাজকীয় সম্বর্ধনা জানানো হয়, রিপাবলিকান গার্ডের একটি সুসজ্জিত দল বিমান বন্দরে তাঁকে ফৌজী সালাম জানিয়ে অভ্যর্থনা করে। রাজার অসুখটাকে বলা হয় "মিউজিয়ামের অসুখ"—বায়ুবাহিত এক ধরনের ছাতা কায়রোর মিউজিয়ামে মমির বাক্সে ঢুকে পড়ে মমিটা আক্রমণ করেছিল। ফরাসি বিশেষজ্ঞরা অবশ্য কোবাল্ট ৬০-এর রশ্মি প্রয়োগ করে একে সম্পূর্ণ সারিয়ে পুনরায় মিশরে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কি কৌশল প্রয়োগে সেকালে মৃতদেহ মমি করা হতো? নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষিত হয়নি বলে কৌশলটি পুরাপুরি এখন আর জানা যায় না, তবে কিছু কিছু আন্দাজ করা যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দের গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসে যে বর্ণনা রেখে গেছেন তার থেকেও কিছু আভাস মিলে। মমি যারা তৈরি করতো তাদের মুখে মুখোশ আঁটা থাকতো শিয়ালের মুখের মতো। কারণ বোধ হয় মৃত আত্মার দেবতা আনুবিসের চেহারাটা শেয়ালের মতোই কল্পনা করতো মিশরীয়রা।

নীল নদের অপর পারে এক নির্জন জায়গায় মৃতদেহকে নিয়ে যাওয়া হতো। সেখানে তার দেহ ব্যবচ্ছেদ করে ভেতরের অঙ্গসমূহ বের করে ফেলা হতো। সেগুলোও অবশ্য সসম্মানে বিভিন্ন পাত্রের মধ্যে পুরে মমির সাথে পরে সমাধিস্থ করা হতো। মাথার মধ্য থেকে মগজও খুব সুকৌশলে বের করে ফেলা হতো। শুধু হৃদপিণ্ডটি যথাস্থানে থাকতো—চেতনার মূল কেন্দ্র বলে কল্পিত হতো এটা, তাই এটা সরানো যাবে না। দেহের ভেতরটা এক ধরনের মদ দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলে তাকে তরলিত গালা জাতীয় রঞ্জন দিয়ে ঢেকে দেয়া হতো। পোকা মাকড়ের আক্রমণ যাতে হতে না পারে।

মূল সমস্যাটা ছিল শরীরের জলীয় ভাগটা দূর করে দেয়া। শরীরের তিন ভাগের দুভাগই পানি। দেহকোষের ক্ষতি না করে কিভাবে এই পানি দূর করা হতো সেটাই ছিল মমি তৈরির আসল রহস্য—এখনো অজ্ঞাত। আধুনিক বিশেষজ্ঞরা আন্দাজ করছেন—নেট্রোন নামক এক রকম প্রাকৃতিক জিনিস, যার মধ্যে সোডা-বাই-কার্বন এবং লবণ থাকতো, তা দিয়ে শরীরটা আগাগোড়া ঢেকে দেয়া হতো। জিনিসটার একটা গুণ হল এটা পানি শোষণ করে নিতে পারে। ৩৫ থেকে ৪০ দিনের মধ্যে এটা পুরো দেহটাকে শুকিয়ে ফেলতে পারে সুন্দরভাবে।

এর পরের কাজটা সুন্দরকরণের কাজ। দেহের ভেতরে কাপড় বা করাতের গুড়ো ঢুকিয়ে আবার একে সুডোল করে নেয়া হতো স্বাভাবিকের মতো। যেখানে কাটা হয়েছিল তা সোনার পাত দিয়ে ঢেকে দেয়া হতো। চোখের জায়গায় কৃত্রিম পাথর

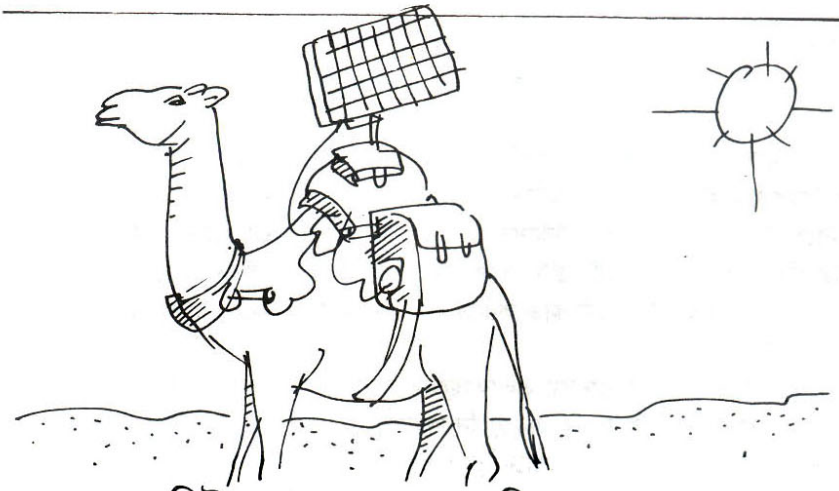
বসিয়ে দেয়া হতো। নানাভাবে মুখের আদলটা সংরক্ষিত করারও চেষ্টা করা হতো। প্রচুর যত্ন নেয়া হতো এই কাজগুলো করে দেহের বাহ্যিক সৌন্দর্যটা রক্ষা করার জন্য। এমন সব সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করা হতো যে-কোন কোনটায় সুবাস এখনো পাওয়া যায়।

এরপর আসে মমি ঢেকে দেয়ার পালা। দীর্ঘ ব্যান্ডেজের কাপড় দিয়ে সুন্দর করে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলা হতো একে। উপরের দিকে নানা বর্ণের কাপড় ও ডিজাইন ব্যবহার করা হতো এই কাজে। এত সবের পর বহু উৎসব-আয়োজন তন্ত্র-মন্ত্রের মধ্য দিয়ে মমির স্থান হতো সমাধিতে। সুন্দর সব কফিন ব্যবহার করা হতো ওদের রাখার জন্য। তার গায়ে বিচিত্র শিল্পকর্ম, মুখে মৃত রাজন্যের মুখাবয়ব খোদাই করা। পরলোকে তাঁর যেন কোন অভাব না ঘটে সেজন্য দেয়া হতো প্রচুর রত্নরাজি, ব্যবহার্য জিনিস।

এই রত্নরাজিই কিন্তু অধিকাংশ মমির কাল হয়েছে। সেই সময় থেকেই এক ধরনের কবরচোরের কাজই ছিল এসব সমাধি খুঁজে বের করে ধন-রত্ন হাতিয়ে নেয়া। এটা করতে গিয়ে সমাধির এবং মমির প্রচুর ক্ষতি হতো। পরে বহু মমি পাওয়া গিয়েছে যাদের গায়ে এরকম ডাকাতির চিহ্ন রয়েছে।

১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন মিশর দখল করলে সেখানে পুরাতত্ত্ব নিয়ে প্রথম সুশৃঙ্খল কাজ আরম্ভ হয়। ইউরোপ থেকে বিশেষজ্ঞরা আসেন। মমিগুলোর অবিকৃত রূপ তাঁদেরকে স্তম্ভিত করে দেয়। পরবর্তীকালে সারা ইউরোপ এই মমির জন্য—তা দেখার জন্য মেতে ওঠে। এমন অবস্থা হয় যে নকল মমিও বের হতে থাকে প্রচুর। এক সময় অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে মাত্র দেড়শ ডলারে মমির বেচাকেনা হতে থাকে—বলাবাহুল্য তার অধিকাংশই জাল মমি। এখন মিশর সে দেশ থেকে মমি বাইরে রফতানি নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। বিজ্ঞানের নতুন পদ্ধতিতে মমির বয়স, পরিচিতি, সঠিকভাবে জানা যাচ্ছে এখন।

নতুন নতুন মমি আবিষ্কৃত হয়ে ইতিহাসের শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে সহায়তা দিচ্ছে। তা ছাড়া পুরানো আবিষ্কৃত মমিগুলোর পদ পরিবর্তন হচ্ছে এর ফলে। যেমন দেখা গেলো যে ৮০ বছর আগে আবিষ্কৃত এক অজ্ঞাত পরিচয় মমি আসলে রানী থিয়ে ছাড়া আর কেউ নন—যিনি রাজা দ্বিতীয় আমেনহোটেপের স্ত্রী এবং বিখ্যাত টুটানখামুনের দাদী। যেই না চিনতে পারা অমনি সসম্মানে রানী মাতাকে মিউজিয়ামে রাজন্যবর্গের জায়গায় তাঁর স্বামীর পাশে স্থান করে দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া মমিগুলো পরীক্ষা করে সে আমলের রোগ-শোক, হিংসাত্মক উপায়ে হতাহত হওয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে, একালের মতো সেকালেও মিশরীয়দের মধ্যে দাঁতের রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি ছিল। তা ছাড়া আজকালকার অনেকগুলো রোগের লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে। মারামারি, হানাহানি হতো প্রচুর—এদিক থেকে একাল-সেকাল কোনটাই কম যায় না। ইতিহাসের এক জ্বলজ্যান্ত সাক্ষী, প্রাচীনের সাথে সংযোগের এক রোমান্টিক উপস্থিতি মিশরের মমিগুলো।



হিউরেকা : অনন্য এক বিজ্ঞান জাদুঘর

ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকি থেকে কয়েক কিলোমিটার উত্তরে ভান্‌তা নামে একটা স্থানে রয়েছে খুবই চিত্তাকর্ষক একটি বিজ্ঞান জাদুঘর হিউরেকা। এর বৈশিষ্ট্য হল অতি সরলভাবে বিজ্ঞানের যাবতীয় বিষয়কে তুলে ধরার ক্ষমতা—কণিকা বিজ্ঞান থেকে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র এমনকি ভাষার বিবর্তন কিছুই বাদ যায়নি। সবকিছু এত জীবন্ত করে তোলা হয়েছে এবং দর্শককে এতখানি এর মধ্যে টেনে নেবার চেষ্টা করা হয়েছে যে কোন কিছুকে অবহেলা করে ফেলে যাওয়া সহজ হয় না।

উদাহরণস্বরূপ শক্তির রূপান্তর এবং সেই প্রক্রিয়ার এর অপচয়ের বিষয়টি কেমন করে হিউরেকায় বুঝানো হয়েছে দেখা যাক। বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করে একটি বড় ভারী বল উপরে তুলে নিচে ফেলে দেয়া হচ্ছে। এই পড়ার প্রক্রিয়ায় এটি আবার বিদ্যুৎ তৈরি করছে—কিন্তু তা বল তুলতে ব্যবহৃত বিদ্যুতের চেয়ে কম। এই শেষোক্ত বিদ্যুৎ কিছু ক্যাপাসিটরের মধ্যে সঞ্চিত করা হচ্ছে তারপর চলেছে আরো নানা রূপান্তর যেখানে হচ্ছে তাড়িৎ বিশ্লেষণ, তাপ উৎপাদন, আলোক সৃষ্টি। সেই আলো ফটোসেলের মাধ্যমে আবার বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। শেষ পর্যন্ত বহু রূপান্তরিত ক্রম হ্রাসকৃত শক্তি বিদ্যুতের রূপে গিয়ে একটি ক্ষীণ ঘণ্টা বাজাবার মত জোর শুধু রাখতে পারছে। ঐ ভারী বলটি ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সব কাজ পর পর ঘটে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ঘণ্টার ঐ ক্ষীণ পিং ধ্বনির মাধ্যমে শেষ হচ্ছে। এ সব ঘটনাকে একই সঙ্গে ঘটিয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈজ্ঞানিক সত্যকে জাজ্বল্যমান করে তুলতে আর কিসে পেরেছে? হিউরেকা দর্শককে বেশ খানিকটা খাটিয়ে নিতেও সিদ্ধহস্ত—যেন রীতিমত গতর খাটিয়ে বুঝে নিতে পারেন তাঁরা কোন কোন তথ্য। যেমন এক জায়গায় রয়েছে নানা রকম খাদ্য দ্রব্য। পয়সা দিয়ে ও সঠিক নম্বর ডায়াল করে তাঁরা সেটি নিয়ে খেতে পারেন। তারপর সাইকেলের মত যন্ত্রে বসে সেটি প্যাডেল করতে পারেন যতক্ষণ না যন্ত্র বলে দেয় ঐ

খাদ্যের সমপরিমাণ ক্যালরী তিনি এই মাত্র পুড়ে শেষ করলেন। কোন খাদ্যের কত ক্যালরী তা দীর্ঘস্থায়ীভাবে মনে রাখার জন্য এর চেয়ে মোক্ষম পদ্ধতি আর কি হতে পারে?

মানুষের শারীরবৃত্তের প্রত্যেকটি কাজ জ্বলজ্যান্ত করে তোলার নানা উপায় রয়েছে হিউরেকায়। হৃদপিণ্ডের বাম অলিন্দ প্রতিবার সংকোচনে কতখানি রক্ত শরীরে পাম্প করছে তা এক জায়গায় নাটকীয়ভাবে দেখানো হচ্ছে। এর পাশে রয়েছে একটি হস্তচালিত পাম্প। যে কেউ ওটা চেপে দেখতে পারে ঐ পরিমাণ রক্ত পাম্প করতে হৃদপিণ্ডকে প্রতিবার কতখানি কাজ করতে হয়—যে কাজ এটা করে চলেছে প্রতি মুহূর্তে জনম ভর।

ফিনল্যান্ডবাসীদের পানীয়ে এলকোহলের অনাদর আছে এটি কেউ বলবে না। সাধারণ জীবনে এ বিষয়ে খুব একটা নিরুৎসাহিতও করা হয় না। কিন্তু হিউরেকায় এমন একটি মেশিন রয়েছে যেখানে তুলে ধরা হয়েছে এলকোহল শরীরে গেলে শেষ পর্যন্ত তার কি গতি হয়। কোথায় গিয়ে জমে সেটা। বিজ্ঞানের বিভিন্ন জরুরি বিষয়কে বোঝাতে এবং হৃদয়গ্রাহী করতে বহু জায়গায় নাটকীয়তার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। যেমন দুটি টেলিফোন বক্স রাখা হয়েছে—যার ভেতর দাঁড়িয়ে টেলিফোন করা যায়। হীট পাম্পের সাহায্যে এদের একটির উত্তাপ অন্যটিতে নিয়ে গিয়ে স্পষ্ট উত্তাপ পার্থক্যের সৃষ্টি করা হয়েছে উভয়ের মধ্যে। কম্পিউটার প্রোগ্রাম কিভাবে কাজ করে এটি বোঝাবার জন্য এমন কিছু করা হয়েছে যাতে অংশগ্রহণের লোভ কেউ সামলাতে পারবে না। প্রাচীন সুমেরীয়রা কীলকাকৃতির (ছেনির আকৃতি) চিহ্ন দিয়ে তাদের লিপি লিখত যে জন্য তাকে বলা হয় কিউনিফর্ম। এই কম্পিউটার প্রোগ্রাম যে কারো নাম রোমান হরফে লিখে দিলে তা কিউনিফর্ম লিপিতে রূপান্তরিত করে দিতে পারে।

আগামী দিনে শক্তির প্রধান উৎস হবে সৌর শক্তি—এই কথাটি সবার মনে গেঁথে দেবার জন্য হিউরেকা এক অদ্ভুত অথচ বাস্তব দৃশ্য বেছে নিয়েছে। মরুভূমির উট বহন করে চলেছে সুদূর মরুর বেদুইন শিবিরের জন্য প্রতিষেধক টিকা। খাঁ খাঁ রোদে উট চলেছে, তার পিঠে মেলা আছে সৌরকোষের প্যানেল, সেটি বিদ্যুৎ তৈরি করছে ছোট রেফ্রিজারেটরকে শীতল করার কাজে, যেই রেফ্রিজারেটরের মধ্যে ভাল থাকছে সেই টিকা'।

হিউরেকার মূলমন্ত্র হল দর্শকের অংশগ্রহণ। দর্শক তাই এখানে লৌহযুগের বাড়িতে কাজ-কর্মে হাত লাগতে পারেন—যে বাড়ি ঠিক তেমন আবহ সৃষ্টি করে রেখেছে যেমনটি ছিল কয়েক হাজার বছর আগে। সেদিন যেমন করে বেতের বা মাটির সরঞ্জাম তৈরি হতো, শন দিয়ে ছাদ ছাওয়া হতো, পীট কয়লা পাতা হতো সে সব কাজ করার অভিজ্ঞতা আজকের দর্শককে সর্বাংশে কিছুক্ষণের জন্য সেই যুগে নিয়ে যেতে পারে। তেমনি সুযোগ রয়েছে এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন স্থলের অভিজ্ঞতা নেয়ার। সত্যিকার একটি খনন স্থল কাছেই রয়েছে—কাজে নেমে পড়া যায় সেখানে।



অন্যরকম কিছু জাদুঘর

১৯৫৮ সালের কথা। নীল কোসোন নামে এক ইতিহাস উৎসাহী তরুণ বেড়াতে গিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের সেভার্ন নদীর পারে শ্রপশায়ার কাউন্টির কিছু জায়গায়। ঘন সবুজ ঝোপে ঢাকা ঢেউ খেলানো প্রান্তর। হঠাৎ কোসোন হোঁচট খেলেন পুরানো কিছু চুল্লীর ভগ্নাবশেষে। ইট খসে খসে পড়ছে, জরাজীর্ণ অবস্থা। আরো কিছু পদচারণা কোসোনকে আনলো পুরানো খনির বিশাল অবক্ষয়িত এক উত্তোলন চাকার কাছে—পোড়া বাড়ির মত কিছু গুদামও দেখা গেল। এর কোনটিই থমকে দাঁড়াবার মত তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু কোসোন থমকে দাঁড়ালেন।

হ্যাঁ, এই জায়গায়, ঠিক এই জায়গাতেই তো ১৭০৯ সালে প্রথম লোহার উৎপাদন হয়েছিল—সস্তায়, এক সঙ্গে অনেক পরিমাণে। সেভার্নের পারে পারে আর একটু হেঁটে গেলেই আয়রন ব্রিজ দুনিয়ার প্রথম লৌহ নির্মিত সেতু। নির্মাণের দু'শ বছর পরে আজও অক্ষত রয়েছে—পার হয়ে যাওয়া যায় নদী এখনো এর উপর দিয়ে। প্রথম লোহার রেল রাস্তা, প্রথম রেল ইঞ্জিন, প্রথম লোহার নৌকা—সবই নির্মিত হয়েছিল এর আশেপাশে। কোসোনের মনে হল এমনি করেই কি এসব মূল্যবান স্মৃতিচিহ্ন কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে? না তা হতে দেয়া যায় না।

প্রাচীন জিনিসের প্রতি মানুষের উৎসাহ আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এতো সেই অর্থে প্রাচীন নয়—দু'তিন শ বছরের কথা মাত্র। মিশরের পিরামিডের বনেদীপনা এর নেই। আর প্রযুক্তির প্রতিভার স্বাক্ষরের কথা যদি বলি তা হলেও তো এর চেয়ে পুরানো বিষয় রয়েছে। যেমন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি উড়োজাহাজের ডিজাইন করেছিলেন ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শুরুতে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে প্রযুক্তিকে আঁকজোকের বাইরে এনে মানুষের জীবনের জন্য বাস্তবায়নের কাজটি শিল্প বিপ্লবের আগে হয়নি। আব্রাহাম ডার্বি যখন লোহা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব আনলেন, জেম্‌স ওয়াট বাষ্পীয় ইঞ্জিনকে যথাযোগ্য

করে তুললেন আর রিচার্ড আর্করাইট যখন স্পিনিং জেনী উদ্ভাবন করে সুতা কাটার ব্যাপারটিকে ব্যাপক করে তুললেন—তখনই প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে বদলাতে শুরু করলো দ্রুতগতিতে। এর সবই ঘটেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে—ওটাই শিল্প বিপ্লবের শুরু।

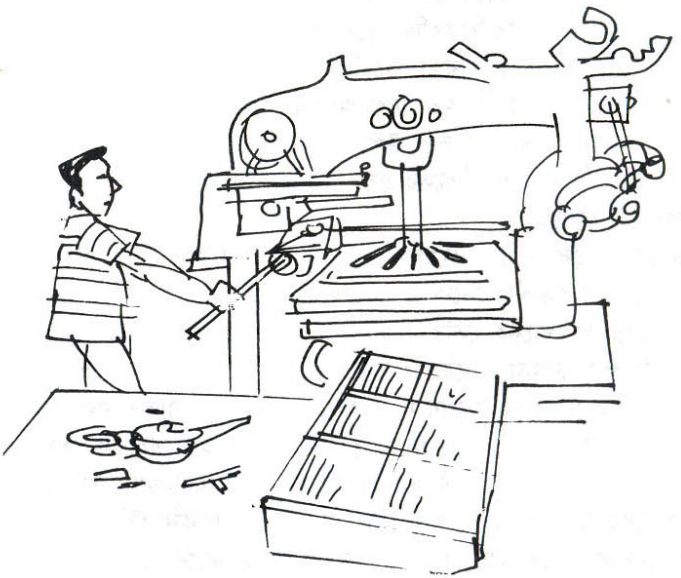
নীল কোসোন যখন এসব নিয়ে ভাবছিলেন তার পর পরেই শিল্প প্রত্নতত্ত্ব বিষয়টি নিয়ে মানুষ বেশ আগ্রহী হয়ে পড়লেন। ইতিহাস সচেতন কেউ কেউ বললেন যে, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মেশিনগুলো আর শিল্প বিপ্লবের অন্যান্য স্মৃতিচিহ্ন আধুনিক মানুষের পটভূমি বুঝতে যতখানি সহায়তা করবে প্রাচীন অনেক গির্জা বা মন্দির তা করবে না। অথচ সেগুলো রক্ষায় আমাদের তুলনামূলক উদ্যোগ অনেক কম। উদ্যোগীরা তাই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন দেশে দেশে। পরিত্যক্ত রেলস্টেশন, ভাঙা অব্যবহৃত বাষ্পীয় ইঞ্জিন, খালের মধ্যে যাতায়াতের বাতিল বার্জ, জেটি, গেইট—আরো কত কি এখন সযত্ন সংরক্ষণের দাবিদার হচ্ছে!

আইরন ব্রিজ মিউজিয়ামের কথাই ধরা যাক। নীল কোসোন যেখানে সেই প্রথম কথাটি ভেবেছিলেন সেখানে ছয় বর্গমাইল এলাকা জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে এই জাদুঘর। বছরে আড়াই লক্ষ দর্শক আসেন এই জাদুঘর দেখতে। ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন দর্শনীয় অঞ্চলে এটি বিভক্ত। এর মধ্যে একটি অঞ্চলে শিল্প বিপ্লব যুগের আবহ সৃষ্টি করা হয়েছে গ্যাসের বাতি আলোকিত দোকান, ছোট কারখানা ইত্যাদির মাধ্যমে—তখন যেমনটি থাকতো।

জার্মানির শিল্প বিকশিত হয়েছিল রূঢ় অঞ্চলে। সেখানে বোতুম শহরে রয়েছে বিশাল খনি-জাদুঘর। ওখানে যে শুধু বিরাটকায় সব খনন যন্ত্র, হাইড্রলিক পাম্প আর অন্যান্য যন্ত্রপাতির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রয়েছে তা নয়, দর্শককে ভূগর্ভের গহীনে সেদিনের খনি শ্রমিকের সত্যিকার অভিজ্ঞতা দেবার ব্যবস্থাও রয়েছে। ওটাই জাদুঘরটির আসল রোমাঞ্চ। অবশ্য দেখতে যতই বিপদ সংকুল হোক, আজ সত্যি সত্যি কোন বিপদ এখানে নেই—কিন্তু সেদিন ছিল। বিপদের একটি দিক ছিল ভূমিধ্বস থেকে। বিপজ্জনকভাবে ধ্বস নেমে খনির ভেতর পাথর খসে পড়তে আরম্ভ করলে যেই ডালবুশ বোমার আশ্রয় নিতে হতো তাও দেখানো হয় আজকের দর্শকদের। এটি আসলে একটি পুরু ইস্পাতের টিউব যা লম্বা রডের মাথায় লাগানো আছে। বিপদ দেখলে খনি শ্রমিক এর মধ্যে ঢুকে পড়তেন। পাথরের ঝড় ঝাপটা এর উপর দিয়েই যেত, হয়তো কবর হয়ে যেত এর। পরে সম্ভব হলে নলটি (বোমাটি) টেনে উপরে তোলা হতো। আজ দর্শকের কাছে ব্যাপারটি ভয়ংকর ও অদ্ভুত মনে হয়, কিন্তু এভাবেই এগিয়েছে শিল্প বিপ্লব।

শহর-বন্দর-শিল্প নগরীর চেহারা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যেই লোকচক্ষুর অন্তরালে রক্ষা পেয়ে যায় কিছু মূল্যবান পুরানো নমুনা—এক সময় আবিষ্কৃত হয় সবার জন্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংল্যান্ডে ডেভিড কারক্যালডি বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর টেস্টিং যন্ত্র উদ্ভাবনের জন্য। এ যন্ত্রে ধাতুর দণ্ডকে টেনে, মোচড়ে, আঘাত করে তার বলিষ্ঠতা পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। তা ছাড়া গ্রানাইট পাথর, কংক্রীট ব্লক, ইট,

কাঠ এ রকম বহুতরো জিনিস ভেঙে তার উপযুক্ততা পরীক্ষা এটি করতে পারতো। দেশ বিদেশে বহু শিল্প কারখানার প্রয়োজন মিটিয়েছে কারক্যালডির এই বিস্ময়কর যন্ত্র—আর জার্মানির ক্রুপ কোম্পানিকেও ধর্ণা দিতে হয়েছে তাঁর কাছে। তারপর একদিন বিস্মৃত হয়েছেন তিনি এবং তাঁর যন্ত্র। ১৯৭৪ সালে হঠাৎ করে আবিষ্কৃত হল লন্ডনের ৯৯, সাউথ ওয়ার্ক স্ট্রিট এই ঠিকানায় নানা কিছুর ভীড়ের মাঝখানে এক পরিত্যক্ত বাড়ি। দরজার উপর এখনো পড়া যাচ্ছে অস্পষ্ট লেখা—'ক্যারকালডি টেস্টিং এন্ড এক্সপেরিমেন্টিং ওয়ার্কস'। ভেতরে সমস্ত যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার এখনো আছে ১৮৮০-এর দিকে যেমনটি ছিল—আর রয়েছে সেই টেস্টিং মেশিন। এ যুগে এসে আবার যখন উৎসাহী লোকের চোখে পড়েছে অন্তরালে থাকার দিন এর শেষ। গঠিত হয়েছে এর জন্য মিউজিয়্যাম ট্রাস্ট—সৃষ্টি হয়েছে সবার পরিদর্শনের জন্য নতুন জাদুঘর।



শিল্প বিপ্লবের যাবতীয় স্মারকের মধ্যে স্টিম ইঞ্জিন মানুষকে যেভাবে নাড়া দেয়, আর কিছুই সেভাবে নয়। হবে না কেন, বাষ্পীয় শক্তিই তো এসেছিল শিল্প বিপ্লবের প্রথম বড় নিয়ামক হয়ে। সে যুগের বিশালাকায় সব স্টিম ইঞ্জিনের নিশ্চল উপস্থিতি আজ মানুষের কাছে পিরামিডের দ্যোতনা নিয়ে আসে। তবে খুব সম্ভব দুনিয়ার বৃহত্তম সংরক্ষিত স্টিম ইঞ্জিনটি রয়েছে হল্যান্ডের হারলেমে।

বৃটেনে নির্মিত এই ক্রুক্যুইউস ইঞ্জিনটি ১৮৪৮ সালে কাজে লাগানো হয় পানি পাম্প করার জন্য। হল্যান্ডের নিম্নাঞ্চলের বিস্তীর্ণ জায়গা সমুদ্রের পানিতে ডুবে আমস্টারডাম, হারলেম আর লাইডেন নগরীর উপকণ্ঠকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করে দিত। এই বিশাল হ্রদকে সেচে ফেলার মহা কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবেই এসেছিল ঐ ইঞ্জিন। এর

এক একটি সিলিন্ডারের ব্যাস ১২ ফুট—একটি ঘোড়ার গাড়ি চলে যাবার মতই প্রশস্ত। ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত চালু ছিল এটি। আজ যদিও এটি কাজ করছে না—তবুও বছরে ৩০,০০০ দর্শকের জন্য হল্যান্ডের জলময় অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য এটি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজ এটি এক দুর্দান্ত সংগ্রামের নীরব সাক্ষী—সমুদ্রের পানির বিরুদ্ধে হল্যান্ডবাসীর শতাব্দীর পর শতাব্দীর সে সংগ্রাম, শিল্প বিপ্লব যাতে চূড়ান্ত বিজয় এনে দিয়েছে।

অনেক সময় কোন একটা কিছুকে শুধু জাদুঘর হিসেবে সংরক্ষিত করা সম্ভব হয় না অর্থনৈতিক কারণে। কোথাও জায়গার দাম এত বেশি যে কার্যকরভাবে কাজে না লাগালে পুরানো জিনিস সংরক্ষণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। বহু ক্ষেত্রে তাই পুরানো জিনিসকে নতুন কাজে লাগিয়ে দিয়ে তাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়েছে। জার্মানিতে বনের দক্ষিণে গত শতাব্দীর কিছু ধনকুবের শিল্পপতি তাদের প্রাসাদ আর কার্যালয়ের সংযোগের জন্য বিশেষ এক রেল লাইনের ব্যবস্থা করেছিলেন। আর তার যে স্টেশন, স্থাপত্যে, কারুকার্যে তাও ছিল অপূর্ব। ১৯৭০ সালে জার্মান রেলওয়ে স্টেশনটি বাতিল করে দেয় ফলে এর দালানটিও ভেঙে ফেলার উপক্রম হয়। তবে উদ্যোগীদের প্রচেষ্টায় এই ব্যতিক্রমী রেল স্টেশনে কনসার্ট হলের এবং চিত্র প্রদর্শনীর জন্য গ্যালারির ব্যবস্থা করে তাকে রক্ষা করা হয়েছে।

ঠিক এমনি এক ব্যবস্থা হয়েছে উত্তর ফ্রান্সে নর্মান্ডির ছোট্ট ছবির মত শহর অ্যঁফ্লোতে। ষোড়শ শতাব্দীর দিকে এ শহর লবণের ব্যবসার জন্য বিখ্যাত ছিল। তাই এখানে শহরের মাঝখানেই তৈরি হয়েছিল পাশাপাশি দুটি বিশাল লবণের গুদাম। পাথরের তৈরি পুরু দেয়াল, কাঠের খিলান ও বীমের সুউচ্চ ছাদ—ক্যাথিড্রালকেও হার মানায়। কিন্তু নতুন কর আরোপের ফলে অ্যঁফ্লোতে লবণের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সে আজ বহু কালের কথা। তবুও গুদাম দুটিকে বাঁচাতে হবে শহরের সমৃদ্ধ অতীতকে জাগরুক রাখার জন্য। উপায় এনে দিল ঐ গুদামের সুন্দর ধ্বনি-গুণ। তাই আজ এখানে বসেছে শহরের কনসার্ট হল। মাঝখানে আসন পাতা কনসার্ট শ্রোতাদের জন্য। চারদিকে দেয়াল ঘেঁষে আর্ট গ্যালারি। তবে সবাই জানে ঐ ঘর কি জন্য তৈরি হয়েছিল—দেখলেই বোঝা যায়। আর এর নামও হচ্ছে লবণ গুদাম কনসার্ট হল।

ফ্রান্সে আধুনিককালে যে ধরনের জাদুঘর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে তাকে বলা হয় ইকোমিউজিয়াম অর্থাৎ পরিবেশ জাদুঘর। কালের চাকায় মানুষের জীবন পরিবেশ কেমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে তাকে যথাস্থানে জাজ্বল্যমান করে রাখাই এর কাজ। ফরাসি মিউজিওলোজিস্ট হেনরী রিভিয়ে প্রথম এর ধারণা প্রবর্তন করেন। আজ ফ্রান্সে মোট ২৭টি ইকোমিউজিয়াম রয়েছে।

উত্তর ফ্রান্সের ব্রিটানিতে রেন শহরে লা ব্যাঁটিনা ইকোমিউজিয়ামের কথা ধরা যাক। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ১ কিলোমিটারের বড় এলাকা জুড়ে এর প্রদর্শনী। আসলে এটি একটি সত্যিকারের খামার—মালিকরা পরিত্যাগ করার পর বাড়িঘর, গোলা, জমি সমেত জাদুঘর করে ফেলা হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু করে মাত্র ক'বছর আগে পর্যন্ত খামারটির পুরো ইতিহাস এতে ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর মধ্যে ঐ অঞ্চলে

এবং সারা দেশে বহু ওলট পালট হয়ে গেছে। সবকিছুর ছাপ পড়েছে খামারের ও তার মানুষজনের উপর।

কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে তাই আয়োজন করা হয়েছে এই ইতিহাসের নানা নমুনার প্রদর্শনী। প্রথম কক্ষে ডাটা ব্যাংক—কম্পিউটারে সংরক্ষিত আছে এর সমস্ত তথ্য, বোতাম টিপে দর্শক দেখতে পারেন। সেই সঙ্গে স্লাইড শো। দর্শক প্রত্যেক কক্ষে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সুর, লোক সঙ্গীত আর স্লাইড শো'র বর্ণনা দিয়ে ঐ কক্ষের বিশেষ কাল ও বিষয়কে ব্যাখ্যা করা হয় আগে। ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলার আরো বহু পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে এতে।

খামারটির আদি মালিক—তাঁর পরিবার, খামার কর্মী, ছবি ও মডেলের সাহায্যে মূর্ত হয়েছেন। সেদিনের পোশাক, আসবাব, খামার যন্ত্র সবই রয়েছে। রান্নাঘরটি রয়েছে হুবহু। ভূগর্ভস্থ তলে আপেল পেষাই করে সাইডার মদ তৈরির যন্ত্রপাতি এমনকি গন্ধটুকুও অবিকল। এর মধ্যে ফরাসি বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব, আধুনিকতা, মহাযুদ্ধ সব একে একে বদলে দিয়ে গেছে খামারের চেহারা, এর হাতিয়ার, এর মানুষগুলোর আচার আচরণ। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি এসেছে, খামার কর্মীর সংখ্যা কমেছে, শহর কাছে চলে এসেছে, পরিবারের অধিকাংশ খামারের প্রতি উৎসাহ হারিয়েছে। অবশেষে শেষ মালিকটিও চলে গেছেন খামারের মায়া ত্যাগ করে এটিই তো নিয়ম, এটিই তো ঘটেছে সর্বত্র। তবুও মানুষ জানতে চায় কেমন করে ঘটলো এসব—কেমন ছিল সেদিনের দিনগুলো।

ভিন্নধর্মী আর একটি ইকোমিউজিয়াম রয়েছে লেক্ল্যুসোতে। এক সময় যোগাযোগ ব্যবস্থায় বড় ভূমিকা ছিল ফ্রান্সের খালগুলোর। স্থানে স্থানে হ্রদের উচ্চতার পার্থক্যের কারণে তৈরি করতে হতো লক গেইট। গেইট বন্ধ করে পানি ঢুকিয়ে বা বের করে দিয়ে যথাযথ সমতলে তুলে আনা হতো জলযানকে। এ কাজ ছিল লককীপারের—সঙ্গেই তাঁর কুটির। এই খালের ধারের নিত্য কাজকে ঘিরেই তাঁর গান তাঁর জীবনের বহমানতা। আর এ সবের স্মৃতি চিহ্ন ও স্থানীয় গ্রামের পরিবেশকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে লেক্ল্যুসোর ইকোমিউজিয়াম।

বিউভাই অঞ্চলে আর একটি ইকোমিউজিয়াম দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে এখানকার ঐতিহ্যবাহী ও বর্তমান কিছু শিল্পের উপর। মৃৎপাত্র, পশম এবং ব্রাশই এ শিল্পের প্রধান উপজীব্য। এক শ' বছর আগে পশমকে কিভাবে কাপড়ে রূপ দেওয়া হতো সেই পদ্ধতি ও উপকরণকে ধরে রাখা হয়েছে ফোরমীতে একটি ইকোমিউজিয়ামে। পুরানো এক বস্ত্রকলকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে সেটি।

অতীতের পরিবেশে ও ঐতিহ্যে যা ছিল তার অনেকখানি মানুষকে নতুন করে আকর্ষণ করছে। তাই এর সবকিছু অদৃশ্য হয়ে যাক এটা অনেকে চায় না। এর মধ্যে মানুষ খুঁজে পেতে চায় নিজের নিরবিচ্ছিন্ন ইতিহাসকে। তাই এমন কিছু জায়গা ও জিনিসকে মানুষ ধরে রাখতে চায় যেখানে গেলে ইতিহাসকে অনুভব করা যায়। বেলজিয়ামের জনৈক শিক্ষক ১৯৭৭ সালে হঠাৎ লক্ষ্য করেন যে তাঁর নিজ শহরের কাছে কিছু পরিচিত জিনিস ভেঙে ফেলা হচ্ছে। এ হল এক খাল থেকে তুলে

জলযানগুলোকে ৫৬ ফুট উপরে অন্য খালে স্থানান্তর করার এক বিশাল বাবস্থা। মাত্র ১২ মিনিটেই এটি সম্পন্ন হতে পারে যেখানে লক গেইটে ঘণ্টা লেগে যেতে পারে। কোন শব্দ নেই, পরিবেশ নষ্টকারী ধোঁয়া নেই এবং কোন দুর্ঘটনা নেই—১৮৮৮ সালে বসাবার পর একটিও দুর্ঘটনা ঘটেনি। একজন শিক্ষকের সচেতনতা ও আন্দোলন সৃষ্টির ফলে এমনি মূল্যবান প্রকৌশল নমুনা ভবিষ্যতের জন্য রক্ষা পেয়ে গেলো।

এসব রক্ষা করা হচ্ছে যাতে মানুষ থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে পারে। সেদিন কম্পিউটার ছিল না, সূক্ষ্ম কন্ট্রোল সমেত যন্ত্রপাতি ছিল না, তবুও মানুষের দক্ষতা ছিল। এমন দক্ষতা যা ওসব ছাড়াই সৃষ্টি করতে পেরেছিল নিখুঁত প্রযুক্তি। প্রাচীন রোমের আকুয়াডাক্ট বা প্রাচীন মিশরের মন্দিরকে যে রকম শ্রদ্ধার সঙ্গে সংরক্ষণ করা হয় শিল্প বিপ্লবের সেতু,লেদ বা তাঁতকে অনুরূপ সম্মান দিতে মানুষ আজ দ্বিধা করছে না।





প্রাচীন নিদর্শনের আসল নকল

পুরানো জিনিসকে ঘষে মেজে নতুন প্রতিপন্ন করার চেষ্টাটি স্বাভাবিক। কিন্তু কিছু লোক আছে যারা নতুন জিনিসকে নানাভাবে পুরানো হিসেবে চালাবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে। তারা হল প্রত্নতাত্ত্বিক জালিয়াত। পৃথিবীর নানা যাদু ঘরে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের বিকিকিনিতে এমনি বহু নমুনা চালাবার চেষ্টা করা হয় যেগুলো আসলে প্রাচীন নয়, মানুষের সুকৌশল হস্তক্ষেপে প্রাচীনের মত মনে হয় মাত্র। আজকের বিজ্ঞান এখন এগিয়ে এসেছে সহজে নকল থেকে আসলগুলো বেছে নেবার কাজে।

নকল করার কাজে অনেক যে রকম প্রচুর কৌশল, অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রম খাটাচ্ছে তেমনি নকল উদঘাটন করার জন্যও কিছু কুশলী বিজ্ঞানী গড়ে উঠেছেন। তবে উদ্ঘাটনের সব কৌশল তারা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে চান না পাছে নকলবাজরা তার সুযোগ নেয়। কিন্তু তবুও বিজ্ঞানের কিছু কিছু কৌশল এই প্রযুক্তিতে যথেষ্ট স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বিশেষজ্ঞরা একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের দিকে ভালভাবে তাকিয়েই অনেক কিছু বুঝতে পারেন। সাধারণ একটি অণুবীক্ষণের তলায় ধাতু তৈরি নিদর্শনকে দেখলে অনেক সময় বোঝা যায় নির্মাতারা এর উপর কিভাবে কাজ করেছিলো। যেমন জিনিসটিকে কি পিটিয়ে তৈরি করা হয়েছে, না ছাঁচে ঢালাই করে। উনিশ শতকের শেষের দিকে এসে ধাতুর উপর উন্নত ইলেকট্রো-প্লেটিং এর গিল্টি করা সম্ভব হয়েছে। এর আগেকার কষ্টসাধ্য সিলভার প্লেটিংগুলো দেখলেই বোঝা যায়।

বৃটিশ মিউজিয়ামে সোনার তৈরি একটি সুন্দর ব্রেসলেট আছে যাকে মিশরের টলেমী আমল অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ১০০ অব্দ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যকার বলে মনে করা হতো। সোনার যেই তারের দ্বারা এটা তৈরি সম্প্রতি অণুবীক্ষণের তলায় তার গায়ে লম্বা লম্বা হালকা আঁচড়ের দাগ দেখা গেছে। আজও স্বর্ণকাররা নানা আকারের ছিদ্রের মধ্য

দিয়ে সজোরে টেনে নিয়ে গিয়ে সোনার তার তৈরি করে। এটি করতে গেলে এরকম আচড় পড়ে। কিন্তু সে যুগের মিশরে এই পদ্ধতি চালু ছিল না। বরং চিকন ধাতুর পাতকে দড়ির মত পেঁচিয়েই তার তৈরি হতো। অতএব, নকলের সন্দেহ ঘনীভূত হতে দেরি হয়নি।

জালিয়াতি ধরতে হলে অবশ্য প্রায়ই নিদর্শনটির বহির্দৃশ্যের ভেতরে ঢুকতে হয় এক্সরে' অথবা ও রকম অন্য কোন সন্ধানী বিকিরণের সাহায্যে। একটি নমুনার কথা ধরা যাক। বাইরে থেকে দেখতে মনে হল ব্রোঞ্জের একটি নিখুত প্রাচীন চীনা কলস। অথচ এক্স রে' বিশ্লেষণে ধরা পড়লো এর মধ্যে যথেষ্ট ফাটল ইত্যাদি রয়েছে এমনকি এর যে তলার দিকের অংশ সেটি সম্পূর্ণ অন্য একটি কলস থেকে এসেছে। সবুজ ম্যালাকাইট পাথরের চূর্ণ প্লাস্টার অব প্যারিসের সঙ্গে মিশিয়ে তার প্রলেপে কলসের বাইরের নিখুঁত রূপ সৃষ্টি করা হয়েছে মাত্র।

সত্যি সত্যি কি বস্তুতে নিদর্শনটি গড়া তার বিশ্লেষণ এমনভাবে করা চাই যাতে করে জিনিসটি নষ্ট না হয়। তা করার চমৎকার একটি পদ্ধতি হল এক্স-রে ফ্লোরোসেন্স। নিদর্শনটির উপর এক্স-রে ফেললে এর কিছু পরমাণু এক্স-রে'র প্রভাবে আয়নিত হয়ে পড়ে এবং সেগুলো থেকে দীর্ঘতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এক্স-রে' নিঃসরিত হয়। নিঃসরিত এক্স-রে'র স্বরূপ থেকে বোঝা যায় ঐ পরমাণুগুলো কোন পদার্থের। এই পদ্ধতি অবশ্য বস্তুর পৃষ্ঠদেশের খবরই শুধু দিতে পারে। বাইরের আবহাওয়ার সঙ্গে দীর্ঘ বিক্রিয়ার ফলে পৃষ্ঠ দেশের বাইরে যে আবরণ পড়ে তার সঙ্গে মূল বস্তুর বিশেষ মিল থাকে না। তবে জালিয়াতি ধরার জন্য এই আবরণটি সম্বন্ধেও তথ্য উদ্ধার করা চাই।

বহু শতাব্দীর বিক্রিয়ায় ব্রোঞ্জের উপর যে আবরণ পড়বে তা অল্প কয়েক দিনে সৃষ্টি করার জন্য নকলবাজের চেষ্টার অন্ত নেই বিশেষ রাসায়নিক দ্রবণে ডুবিয়ে রেখেও চেষ্টা করা হয়। তা ছাড়া সঠিক রাসায়নিক দ্রব্যের গুড়া আঠার সাহায্যে প্রলেপ দিয়ে এ কাজ করা হয়। কিন্তু আল্ট্রাভায়োলেট আলোর সামনে ধরলে আঠার জৈব পদার্থগুলো উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর পিতলের সামগ্রী বলে দাবি করা হয়েছে এমন কিছু জিনিসের মধ্যে সম্প্রতি জালিয়াতির হাত আবিষ্কৃত হয়েছে। পিতল জিনিসটি এমনিতেই অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক। আগে ব্যবহৃত হতো তামা আর টিনের সংকর ব্রোঞ্জ। পরে টিনের বদলে দস্তা এসে হয়েছে পিতল। কিন্তু সেদিনকার পিতলে দস্তার পরিমাণ থাকতো অপেক্ষাকৃত কম, আর অবশ্যই কিছু টিন ও সীসা মেশানো থাকতো। এক্স-রে ফ্লোরোসেন্স পদ্ধতিতে যেই দেখা গেল এই পিতলের সামগ্রীগুলোতে দস্তা অনেক বেশি, টিন বা সীসার লেশমাত্র নেই তখন বোঝা গেল জিনিসগুলো সাম্প্রতিক। সন্দেহের আরো কারণ হল পিতলের পাতগুলোর পুরুত্ব সর্বত্র অতিমাত্রায় সুসম। রোলিং পদ্ধতিতে ধাতুর সুসম পাত সৃষ্টির কায়দা বিংশ শতাব্দীরই প্রযুক্তি, ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রযুক্তি ছিল অনেক বেশি স্থূল।

প্রাচীন আমলের মূল্যবান ধাতুর সামগ্রীগুলোও রাসায়নিক বিশ্লেষণে যাচাই হতে পারে। যেমন খনি থেকে প্রাপ্ত রূপায় সব সময় খুব সামান্য সোনা মেশানো থাকে। শুধু

সাম্প্রতিককালেই এই সোনা আলাদা করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীন রৌপ্য সামগ্রী মাত্রেই খুব সামান্য সোনার উপস্থিতি থাকবে। আবার সে সময় সোনা পাওয়া যেত নদীর বালির মধ্যে, আজকের মত গভীর খনিতে নয়। বালিতে মিশ্রিত সোনায় সামান্য ওসমিয়াম আর ইরিডিয়ামের রেশ থাকে। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষায় এই রেশটুকু সহজে ধরা পড়ে।

প্রত্নতাত্ত্বিক জালিয়াতি যে শুধু ধাতুর সামগ্রী নিয়ে হয় তা নয়, মাটির বা সিরামিকের পাত্র বা পাত্রের টুকরা ইত্যাদি নিয়েও তা কম হয় না। প্রাচীন পাত্রের আদলে নতুন মৃৎ পাত্র গড়ে তাকে পুরানো চেহারা দেওয়া খুব কঠিন নয়। সে ক্ষেত্রে নকল ধরার একটি অব্যর্থ অস্ত্র হচ্ছে থার্মোলুমিনেসেন্স পরীক্ষা। উত্তপ্ত করলে মৃৎ পাত্র থেকে আলো বিচ্ছুরিত হবার ধর্মটিই থার্মোলুমিনিসেন্স। দুই বিভিন্ন কালের মৃৎপাত্রের এরকম বিচ্ছুরিত আলো এক হয় না। এই পদ্ধতিতে নিয়মিতভাবে মাটির ও সিরামিকের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো পরীক্ষা করা শুরু হয়েছে ১৯৬৯ সাল থেকে। সে বছর এক নাটকীয় উদ্ঘাটনের ফলেই তা হয়েছে।

পঞ্চাশের দশকে তুরস্কে কিছু খনন কার্যের ফলে খ্রিস্টপূর্ব সাত শতকের কিছু মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়। পরে দেখা যায় যে এখানকার একটি বিশেষ সুদৃশ্য পাত্র একাধিক সংগ্রাহকের কাছে দেখা যাচ্ছে—যার সব ক'টি আসল হতে পারে না। অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীরা তখন থার্মোলুমিনেসেন্স পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখালেন এদের কোনটিই ঐ খননে প্রাপ্ত অন্যান্য মৃৎ পাত্রের মত একই আলো দিচ্ছে না। বরং এটি মেলে দশ বিশ বছর আগে তৈরি মৃৎ পাত্রের সঙ্গে।

ব্রোঞ্জের প্রাচীন নিদর্শন আসল কিনা বোঝার জন্যও এই একই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়, কারণ ব্রোঞ্জের মূর্তি গড়তে মাটির ছাঁচের প্রয়োজন হয়। সাধারণত কাদার তৈরি একটি অন্তর্মূর্তি দিয়েই কাজটি শুরু হয়। তার উপর দেওয়া হয় মোমের আবরণ, তার উপর আবার আর এক প্রস্থ কাদার আবরণ। মাঝখানের মোম গলিয়ে ফেলে সেই ফাঁকা জায়গায় তরল ধাতু ঢেলে তৈরি হয় চূড়ান্ত মূর্তি। তারপর ভেতরে মাটির অন্তর্মূর্তি ভেঙে বের করে ফেলতে হয়। কিন্তু ভেতরে অগম্য জায়গাগুলোতে কিছু মাটি শেষ পর্যন্ত আটকে থাকে। এই মাটির থার্মোলুমিনেসেন্স পরীক্ষা বলে দেয় ব্রোঞ্জ কখন ঢালাই করা হয়েছে দু'বছর আগে, না দু'হাজার বছর আগে।





জামদানী

বস্ত্রের ক্ষেত্রে যা আমাদের একান্ত নিজস্ব, ঐতিহাসিকভাবে যা আমাদের গর্বের বস্তু তা হল ঢাকাই জামদানী। জামদানীর সুতা, এর ডিজাইন-এর তৈরিতে কুশলতা সবই অনন্য। জামদানী সর্বোচ্চ উৎকর্ষ সম্ভব হয়েছে তন্তুর ক্ষেত্রে ঢাকার বিশ্ববিখ্যাত অবদান ঢাকাই মসলিনের গুণে। এই উন্নত তন্তুতে বোনা এত মিহি বস্ত্র এক দিন দুনিয়ার বিস্ময় ছিল। বিশ্ববাজারে তাই সেদিন এর কাব্যিক সব নাম দেওয়া হতো—'আব-ই-রওয়ান' অর্থাৎ উচ্ছল পানি, 'শরবতী' কিংবা 'শবনম' অর্থাৎ শিশির। এই মিহি মসলিন বস্ত্রের উপর কুশলী কারিগরের নিপুণ হাতের ধৈর্যশীল ছোয়ায় এটি যখন সেই বিশেষ মোটিফে চিত্রিত হয়ে ওঠে—তখনই সৃষ্টি হয় সেই উচ্চাঙ্গের সৌষ্ঠব যার নাম জামদানী।

জামদানী শব্দটার শাব্দিক অর্থ পারস্য দেশের বিশেষ একটি মদিরা পাত্র। হয়তো তার উৎকর্ষের কথা স্মরণ করে, অথবা সেই পাত্রটির অংশবিশেষ এই নকশায় চিত্রিত হতো বলে এই নাম। প্রাচীনকাল থেকেই ঢাকাই মসলিন ও জামদানী তৈরি হয়ে আসছে। তবে মোঘল আমলেই এটি উৎকর্ষের চরমে পৌঁছে। মোঘল রাজধানী ঢাকার আশেপাশে গড়ে ওঠে মসলিন তন্তু আর জামদানীর কারখানা—বিশিষ্ট কুশলী কারিগরদের হাতের নৈপুণ্যই ছিল যার প্রধান সম্পদ। তা ছাড়া এর ভিত্তি ছিল এই অঞ্চলে উৎপন্ন বিশেষ ধরনের কার্পাস যাকে হাতের চরকায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম তন্তুতে রূপ দেওয়া সম্ভব হতো। ইংরেজ আমলে রাজশক্তির এবং বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থে এই শিল্পে অনেক ভাটা পড়ে। কিন্তু তবুও জামদানীর শিল্প বিলুপ্ত হয়নি, আজও এটি আমাদের গর্ব। জামদানীর বড় বৈশিষ্ট্য তার নকশায়। মোটিফ বেছে নেওয়া হয় প্রকৃতির পরিচিত নানা জিনিস থেকে। কিন্তু জামদানীতে যখন আসে তখন কিন্তু হুবহু প্রকৃতির মতো আসে না, আসে কিছুটা বিমূর্ত জ্যামিতিক ছাঁদে, বার বার পুনরাবৃত

হয়ে। বক্র রেখাগুলো এখানে গড়ে উঠে ছোট ছোট সরল রেখার সমবায়। প্রতিসাম্যের প্রয়োজন ছাড়িয়ে যায় প্রতিকৃতির প্রয়োজনকে তাই জামদানীর নকশায় আম আর হুবহু আম থাকে না, ময়ূর ময়ূর থাকে না—রূপ লাভ করে একটি অনন্য মোটিফকে দেখা মাত্র বলা যায়। এটি জামদানী। এত প্রাচীন একটি শিল্পে আধুনিক বিমূর্ততার এই ছোঁয়া এটি অবাক হবার মত। জামদানী নকশায় আর একটি বৈশিষ্ট্য হল নকশাটি কাপড় বোনার সময়েই একই সঙ্গে গ্রথিত হয়ে যায়; একে পরে এমব্রয়ডারী করে বা ছাপিয়ে কাপড়ে আনা হয় না। কাজেই জামদানীর যিনি সৃষ্টিকার তিনি কাপড় বুনে যান অতি ধীরে ধীরে প্রতি পর্যায়ে সেই জটিল মোটিফকে ফুটিয়ে তুলতে তুলতে।

প্রকৃতির যে বস্তুর অনুকরণে এক একটি মোটিফ আসে এর নামকরণও হয় তারই নামানুসারে। এ সব নামের মধ্যে রয়েছে তারা, ময়ূর, আম, বাক্সনলী, কাল্‌কা, হাঁসা ইত্যাদি। কখনোবা একটি মোটিফ বহুবার বিশেষভাবে সাজানোর গুণেই বিশেষ রূপ লাভ করে। যেমন হাজার পান্না নামক পরিচিত মোটিফে এমেরাল্ড কাট রত্নের আকারের জ্যামিতিক রূপ বহুবার পুনরাবৃত হয়ে ফুলেল রূপ নেয়। ঘন মোটিফগুলো সাধারণত শাড়ির আঁচলে ব্যবহৃত হয়। আবার বৃহত্তর জমিনে থাকে অপেক্ষাকৃত হালকা জালের মোটিফ। এমনি একটি জাল হচ্ছে করলা জাল। জামদানীর নকশায় রঙ ব্যবহার করা হয় কিছুটা সাবধানী, চাপাভাবে। যেমন এর নকশায় তেমনি এর রঙেও সুন্দর গাম্ভীর্যের ভাবটাই সাধারণত প্রাধান্য লাভ করে। জামদানীর উৎপাদনে ব্যবস্থাপনায় কিছু পরিবর্তন কালের প্রভাবে দেখা দিয়েছে। এক সময় এর পুরো কাজটি হতো ছোট ছোট পারিবারিক কুটির শিল্পে। কার্পাসের চাষটুকু বাদ দিয়ে সুতা কাটা, সুতা রাঙানো, জামদানী বোনা সবই হতো ঐ বাড়ির পরিবেশে। কার্পাসও খুব দূর থেকে আসতো না। ঢাকার অদূরে কাপাসিয়া নামের মধ্যে আজও সেই ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আজও বংশানুক্রমিক কুশলীদের পারিবারিক কুটির শিল্পেই জামদানী তৈরি হয় বটে কিন্তু সুতা সাধারণত আসে মিল থেকে আর এর জন্য যে কার্পাস তার অধিকাংশই আসে বিদেশ থেকে আমদানি হয়ে।

যেই মসলিন জামদানীর আদি ভিত্তি সেটি তৈরি ঢাকার অল্পসংখ্যক কুশলী পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সূক্ষ্মতম তন্তুগুলো তৈরি হতো সম্পূর্ণ হাতের উপর। এক হাতে টাকু ঘুরিয়ে অন্য হাতে তুলার পাঁজা থেকে তন্তুর যোগান দেয়া হতো। এভাবে তৈরি হতো সূক্ষ্মতম ১০০ কাউন্টেরও অধিক সুতা। এর চেয়ে মোটা সুতা তৈরির জন্য চরকা ব্যবহার করা হতো। সূক্ষ্ম আঁশ ছিড়ে না যাবার জন্য অধিক আর্দ্রতার প্রয়োজন। তাই মসলিন সুতা তৈরি করার জন্য ভোরের দিকে ঘাসের শিশির শুকাবার আগ পর্যন্ত এবং বিকেলের দিকে সূর্যাস্তের দু'এক ঘণ্টা আগে এই সময়টুকুই শুধু ব্যবহৃত হতো। স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে যে জামদানীর সুতা তৈরির প্রক্রিয়াটি ছিল বেশ ধীরগতির একটি প্রক্রিয়া।

আজ সুতা তৈরির ঐ যত্ন প্রয়োজন হচ্ছে না বটে কিন্তু জামদানী বস্ত্র বয়নে হাতের কুশলতা ও ধৈর্যের প্রয়োজন রয়ে গেছে বরাবরের মতই। বহুদিন ধরেই ঢাকার কাছে—ডেমরা অঞ্চল জামদানী শাড়ি বয়নের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত। এখানে গ্রামে গ্রামে

কুশলীদের বাড়িতে তৈরি হয় জামদানী। তাঁতের নিম্নাংশ থাকে ঘরের মেঝের মাটিতে একটি গর্তের মধ্যে, তাঁতীর পা থাকে সেই গর্তে নামানো। কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি তাঁতের সমন্বয়ে ছোট ছোট কারখানা গড়ে উঠেছে। এ সব কারখানায় সারিবদ্ধভাবে তাঁতগুলো থাকে। তবে কোনটাতেই তাঁতের সংখ্যা বিশের অধিক হতে বড় একটা দেখা যায় না।

প্রতি তাঁতে সাধারণত দু'জন কারিগর কাজ করেন। ডান পাশে বসেন অভিজ্ঞ ওস্তাদ কারিগর, আর বাঁ পাশে অপেক্ষাকৃত তরুণ নবিশ। মূল কাপড়ে টানা সুতার মধ্য দিয়ে উপর-নিচ করে মাকু চলাচল করে আড় সুতা নিয়ে। জামদানী নকশার জন্য প্রয়োজনীয় রঙিন সুতা আড় সুতার সঙ্গে জুকিয়ে দেওয়া হয়। বাঁশের তৈরি সরু সূঁচের মাধ্যমে বিভিন্ন রঙের এই সুতা ঢুকানো হয় ঠিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক টানা সুতাকে উপরে বা নিচে রেখে নকশার প্রয়োজন মতো। এই সূক্ষ্ম কাজটি ওস্তাদ কারিগরের। তাঁতে সাধারণ কাপড় বুনতে দেখা যায় কিভাবে ক্রমাগত মাকু আসা যাওয়া করে এবং বোনা অংশ আঁচড়ে নিয়ে দ্রুত একটানা কাপড় তৈরি হতে থাকে। জামদানীর ক্ষেত্রে তা কিন্তু হয় না—এটি অতি ধীর প্রক্রিয়া। একবার মাকু গেল তো সূঁচের সাহায্যে বিভিন্ন রঙিন সুতার নকশা তোলা হল ঐ একটুখানি অংশে। তারপর ঐ টুকু আঁচড়ে ঘন সংবদ্ধ করা হল এবং মাকু ফেরৎ আসলো। এভাবেই একটু একটু করে কাপড় এগোয়, তাতে নকশা ফোটে। মাকু আনা-নেওয়ার কাজ তরুণ শিক্ষানবিশের। এভাবে একটি পুরো শাড়ি তৈরিতে এক সপ্তাহ থেকে তিন সপ্তাহ সময় লেগে যায়।

জামদানীর প্রধান ব্যবহার জামদানী শাড়িতে। দেশের ঐতিহ্য মণ্ডিত, দেশীয় কারিগরের শিল্প সুষমায় গড়া শাড়ি হিসেবে জামদানী শাড়ি অনন্য। তবে জামদানী মোটিফ আজ শুধু শাড়িতেই সীমাবদ্ধ নেই। অন্যান্য পোশাক, চাদর, রুমাল, কার্পেট, হাতব্যাগ এমনকি স্টেশনারী দ্রব্যেও জামদানী মোটিফ ব্যবহৃত হচ্ছে। চিত্র কলার একটি স্বীকৃত রূপ হিসেবে এটি আজ অনেক বেশি জনপ্রিয়। শুধু আমাদের দেশেই নয়, জামদানী মোটিফের আত্মীকরণ ঘটেছে সুদূর নেপালেও, বহুকাল থেকেই। যেই টুপীটি নেপালের জাতীয় পোশাকের অন্তর্ভুক্ত তার চিত্রণটি জামদানী মোটিফে এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার হিসেবেই বোধ হয়, এই টুপীটির নেপালী নাম ঢাকাই টুপী।

জামদানী শাড়ির শিল্পটি অল্পসংখ্যক কুশলী কারিগরদের দক্ষতা ও শ্রমের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। অথচ উন্নতমানের সুতার দাম ও সাধারণ দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতিতে তাঁরা আজ বিপর্যস্ত। শিল্পটির নিরবচ্ছিন্নতা বজায় থাকছে না বলে অতীতের বহু চমৎকার মোটিফ আজ হারিয়ে যেতে বসেছে—এগুলো দেখতে জাদুঘরে যেতে হয়। উপযুক্ত অর্থ যোগান এবং বাজারজাতকরণের অভাবেও জামদানীর তন্তুবায়রা অসহায় বোধ করছেন। স্বাভাবিকভাবেই উন্নত মানের একটি জামদানী শাড়ির মূল্য অধিক। কিন্তু এর সৌকর্যময় চিত্রকল্পের প্রতি যে অনুরাগ সেটি সব মহলে খুব বিস্তৃত নয়। যে সব অনুষ্ঠানাদিতে দামী শাড়ি কেনার কথা সেখানে জরীময় অধিক চাকচিক্যের বিদেশী শাড়ি অনেক সময় অগ্রাধিকার পায়। এদিক থেকে জামদানীর বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে এর জন্য আরো চাহিদা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আমাদের ঐতিহ্য লালিত জামদানী শিল্পকে তুলে ধরা এবং পৃষ্ঠপোষকতা করা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অন্যতম কাজ হওয়া উচিত।



জিন ব্যাংক : বৈচিত্র্যেই নিরাপত্তা

কলম্বাসের আবিষ্কারের পর ইউরোপীয়রা আমেরিকায় গিয়েছিল। দক্ষিণ আমেরিকার আন্ডিজ অঞ্চল থেকে ইউরোপে এসেছিল এক নতুন ধরনের ফসল—আলু। এর কিছু গিয়েছিল আয়ারল্যান্ডে, সেখানে এটি বেশ আদর পেয়েছে, ক্রমে ব্যাপক চাষ হয়েছে এর। মূল অঞ্চলে যে সব রোগ বালাইয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করে আলুকে টিকতে হতো এই নতুন জায়গায় সেগুলো ছিল না। ফলে আলুর চাষ দারুণ জমলো আয়ার্ল্যান্ডে। ও দেশের গরীব মানুষ আলু খেয়েই জীবন ধারণ করতো। এভাবে বহুদিন ভালই কাটল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে হঠাৎ করে দেখা দিল এক স্থানীয় রোগ—লেইট ব্লাইট নামে পরিচিত আলুর এক ছত্রাকের আক্রমণ ঘটলো। কিন্তু যেই একটিমাত্র আলুর জাত আন্ডিজ থেকে এসে আয়ারল্যান্ডে আসর জমিয়েছিল তার মধ্যে এই ছত্রাকের প্রতিরোধ ক্ষমতা বিন্দুমাত্র ছিল না। কাজেই অল্প কিছু দিনের মধ্যে আয়ারল্যান্ড থেকে আলু সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হল। আলু-দুর্ভিক্ষ নামে পরিচিত সেই করুণ ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিল আয়ারল্যান্ডের বিশ লক্ষ লোক। দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল আরো অধিক সংখ্যক লোক। উজাড় হয়ে গিয়েছিল গ্রামের পর গ্রাম।

এমন নিদারুণভাবে না হলেও অনুরূপ ঘটনা নানা জায়গায় আরো ঘটেছে—আবারো ঘটতে পারে যে-কোন সময়। কারণ অনুসন্ধানও কঠিন নয়। সেই আলু-দুর্ভিক্ষের সময়ও আয়ারল্যান্ডের কৃষকরা বলাবলি করেছেন—আলুর 'শক্তি ক্ষয়' হয়ে গেছে —এর মধ্যে 'নতুন রক্তের' সঞ্চার করা প্রয়োজন। কথাগুলোর মধ্যে এক রকম সত্যতা ছিল বৈকি। এমনিতেই কৃষির মধ্যে নানা রকম ঝুঁকি থাকে। তার উপর যার চাষ করা হয় এর জীবকোষের জিনে যে সব গুণ নির্ধারিত রয়েছে তা যদি সব একই

প্রকৃতির হয় ঝুঁকি আরো বাড়ে। একই গুণ থাকলে যতক্ষণ ভালো ত ভালো, কিন্তু যেই এমন কোন বিপদ দেখা দিল যার বিরুদ্ধে এর কোন প্রতিরোধ নেই তাহলে আর রক্ষা নেই।

এ রকম আকস্মিক বিপদের সম্ভাবনা কিন্তু এখন ক্রমে বেড়ে চলেছে। কারণ কৃষি উন্নয়ন উৎপাদন বাড়াচ্ছে বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফসলের বৈচিত্র্য কমাচ্ছে। সুদূর অতীতে মানুষের চাষ-বাস ছিল স্থানীয় এবং ব্যক্তিগত প্রকৃতির। নানা জায়গায় যে ধান, গম বা যে সব্জি তার মধ্যে নানা রকম স্থানীয় বৈচিত্র্য থাকতো। পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ কম ছিল বলে যারা যাতে অভ্যস্ত তারা সেগুলোই চাষ করতো, অন্যের দ্বারা বড় একটা প্রভাবিত হতো না। ফলে পৃথিবীতে গড়ে উঠেছিল বিচিত্র জনপদে বিচিত্র সব ফসলের জাত। বন্য নানা জাত থেকে কালে কালে মানুষ এগুলো বেছে নিয়েছিল। পছন্দ করা জাতগুলো মানুষ চাষ করতো—বন্যগুলোও পাশাপাশি ছিল, নষ্ট করা হয়নি। কিছু কিছু কাজে লাগানো হতো, ওগুলোকেও সংগৃহীত খাদ্য হিসেবে। সব মিলে এ ছিল এক বিচিত্র জগত। ফসলের জাত আলাদা হতো একই জনপদে এগ্রাম থেকে ওগ্রাম, পাহাড়ের এ ঢালে এক রকম তো ও ঢালে অন্য রকম; নদীর এপাড়ে একটির ফলন বেশি তো ওপারে অন্যটির।

অধিক ফলনের দিক থেকে এটি সব সময় সুবিধার হতো না। সনাতন অভ্যাস আঁকড়ে থাকার ফলে আরো উৎপাদনশীল কিছু আমদানি করার তাগিদ কম ছিল। তখন অবশ্য কৃষির উপর জনসংখ্যার এবং ভোগের চাহিদার এ রকম চাপও ছিল না। তাই মানুষ যা কিছু এমনিতেই ফলে তার উপরই সন্তুষ্ট থাকতে পেরেছে। তাকে অধিক ফলনের পেছনে ছুটে বৈচিত্র্য বিসর্জন দিতে হয়নি। এর একটি বড় সুবিধা হয়েছে কখনো বিপদ আসলে তা সীমাবদ্ধ ছিল একটি জায়গায় সাধারণত একটি জাতের ফসলের উপর। খরায় একটি ফসল নষ্ট হলে পাশাপাশি আরেকটি ছিল যেটি খরা সহ্য করতে পারে। নতুন রোগ এসে একটি ধ্বংস করলেও অন্যটিতে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ছিল বলে তা বেঁচে গেছে। মানুষ একেবারে অসহায় হয়নি।

যোগাযোগের উন্নতির ফলে এক জায়গার ফসল অন্য জায়গায় গেল। ইউরোপীয়রা আমেরিকা গিয়ে সেখান থেকে আনলো ভুট্টা, আলু, মিষ্টি আলু, টম্যাটো, পেপে, তামাক আরো কত কি। চীন থেকে এলো সয়াবিন, চা, নানা রকম শিম, আমাদের এদিক থেকে ইউরোপে গেল ধান, বজরা, কচু, শশা, মরিচ, বেগুন। ইউরোপ থেকে আমাদের দেশে এলো টম্যাটো, কপি, মুলা-গাজর ইত্যাদি নতুন সব্জি। আরো স্থানীয়ভাবেও প্রচুর লেনদেন হল। এতে ক্ষতি কিছু হয়নি, বরং লাভই হয়েছে সব জায়গায় বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়ে।

ক্ষতিটা এলো অন্য দিক থেকে। বিভিন্ন রকম জাতের ফসলের সন্ধান পেয়ে মানুষ এর মধ্য থেকে কোন কোনটিকে বেশি পছন্দ করে ফেললো সার্বজনীনভাবে। পছন্দটি য়িক কারণেই এসেছে—যার ফলন বেশি, বাজার ভালো, অন্যান্য সুবিধা বেশি ক্রমে ক্রমে তারা বেশি ফলাতে লাগলো; অন্যগুলো হল অবহেলিত।

আয়ারল্যান্ডের কৃষকরা যেমন একটি ফসল আলু, তাও একটিমাত্র জাতের আলুর উপরেই তাদের সমস্ত ভরসা রেখেছিল—তেমনি। বিপদও ঘটেছিল হাতে নাতেই।

আজকের বিপদ সম্ভাবনা আরো গুরুতর। কৃষির উপর চাপ এখন প্রচণ্ড। সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে ফলন অনেকগুণ বাড়ানো সম্ভব না হলে আমাদের দেশের মত বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশের মানুষ আজ টিকে থাকতেও পারতো না। উচ্চ ফলনশীলতা এখন দারুণভাবে কাম্য। সব জমিতে এখন আমরা এমন একটি জাতই দেখতে চাই যা ফলে বেশি, একই সার, পানি, কীটনাশকে একই সময়ে দ্রুত যাকে ঘরে তোলা যায়, একই ওষুধে যার রোগ সারে, একই যন্ত্রে যাদের ঝাড়াই মাড়াই চলে। তবেই ব্যাপক এবং নিবিড় চাষের সুবিধা হয়।

এর ফলে বিপুল জনসংখ্যা খেয়ে বাঁচছে, আপাতত খাদ্য সংকটের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে। কিন্তু এরই ফলে অলক্ষ্যে তলে তলে আরো একটি ব্যাপার সংঘটিত হচ্ছে। অনাদি কাল থেকে যে অসংখ্য রকম সনাতন ফসলের জাত এক এক জায়গায় রক্ষিত ও ব্যবহৃত হয়ে আসছিল সেগুলোর কথা এখন মানুষ সম্পূর্ণ ভুলে যাচ্ছে উচ্চ ফলনশীলের আকর্ষণে। ক্রমে ক্রমে সব জমিকে নিবিড় চাষের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে বলে সনাতন জাতগুলোর চাষ যেমন আর থাকছে না, তেমনি বন্যভাবে যে সব জাত টিকেছিল তার আবাসও বিলুপ্ত হচ্ছে। ফলনশীলতায় এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় এদের গুরুত্ব কম সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সব অসংখ্য জাতের ফসলের জীবকোষে নিহিত ছিল এমন অনেক জিন যা বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারতো। নানা বিপদ ঠেকাবার উপাদান এদের অনেকের মধ্যে ছিল, কিন্তু হায় এরা বিলুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিপদমুক্তির সম্ভাবনাটিও আর থাকছে না।

ঘটনাটি যে শুধু অধিক খাদ্য ফলাবার প্রয়োজন যাদের গুরুতর, সেই উন্নয়নশীল দেশে ঘটছে তা নয়, উন্নত দেশেও তা ঘটছে। ইতালী ছিল ফুল কপি ও বাঁধা কপির আদি নিবাস। দক্ষিণ ইতালীর গ্রামে এখনো কৃষকদেরকে দেখা যায় নানা রকম জাতের কপি ফলাতে। কিন্তু এটি আর বেশি দিন দেখা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। আগে এখানকার কৃষকরা সব্জি ফলাতো স্থানীয় বাজারে বিক্রির জন্য। এখন কৃষিকে বৃহৎ ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত করার ফলে তাদেরকে ফলাতে হচ্ছে দূর-দূরান্তের সুপার মার্কেটের জন্য সেখান থেকে যেমন চাহিদা আসে তেমনি করে। লাভজনকভাবে সব রকম জাতকে দূরে এভাবে পাঠানো সম্ভব নয়, তাই ওগুলোর চাষও ক্রমে বাদ পড়ছে।

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এফ. এ. ও-র একজন বিজ্ঞানী ১৯৭০ সালে স্পেনের নানা অঞ্চল থেকে তরমুজ জাতীয় ফলের ৩০০টি আদি জাত সংগ্রহ করেছিলেন। তিন বছর পর তিনি এগুলোর দশটি পুনঃসংগ্রহ করতে একই জায়গায় গিয়ে দেখেন তিনটি ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে। চতুর্থটি যেখানে পেয়েছিলেন সেখানে গিয়ে এবারো পেলেন বটে তবে, সেটিই খুব সম্ভব ছিল সেই জাতের সর্বশেষ নমুনা। কারণ যে কৃষকের জমিতে এর একমাত্র সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তিনি চাষ-বাস ছেড়ে দিয়ে শহরে চলে যাচ্ছেন—তাঁর তরমুজের বীজ মাটিতে ফেলে রেখেই। দেখা গেছে যে

কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পর গত দশ হাজার বছরে আমরা ফসল বৈচিত্র্যের যত না ক্ষতি করেছি শুধু গত এক'শ বছরে করেছি তার চেয়ে অনেক বেশি। ঝোপ, ঝাড়, বন, ডোবা সবকিছুকে নিজেদের কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি বহু জাতের খাদ্য-শস্য এ উদ্ভিদের শেষ আবাস স্থলটুকুকেও।

আজকের যে সব উন্নত জাত, তার যে এত সব বিশেষ গুণ সেও নতুন করে যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা তো নয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক জাতের মধ্য থেকে গুণাগুণ অনুসারে বাছাই করে তাদের সংকর থেকেই তো এসেছে এ সব জাত। তাই খুঁজতে হয়েছে কোনটির আকার বেঁটে, কোনটির ফলন ভাল, কোনটি খরা সয় ভাল, কোনটি বন্যার পানিতে টিকে থাকে, কোনটিতে ছত্রাক কম হয় ইত্যাদি সব গুণ। কোথায় খুঁজেছি—ঐ সনাতন জাতগুলোর মধ্যেইতো যেগুলো এখন বিলুপ্তির পথে। ষাটের দশকে আমাদের দেশে প্রথম যে উফশী ধান চালু হল সেটি ইরি-৮। ইন্দোনেশিয়ার একটি ধান 'পেতা' বেশ তার জীবনীশক্তি। কিন্তু অতিরিক্ত লম্বা বলে নুইয়ে পানিতে পড়ে ধান নষ্ট হয়। ডি-জি-উজেন নামে চীন দেশের একটা ধান—একেবারেই বেঁটে খাটো জাত। উভয়ের সংকর করেই তৈরি হয়েছিল ইরি-৮। এটি পাওয়ার আগে ফিলিপাইনে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (ইরি) বিজ্ঞানীদেরকে অনেক বছর ধরে সারা দুনিয়া থেকে আনা হাজার হাজার জাতের ধান গজাতে হয়েছে, বাছাই করতে হয়েছে। ঘটাতে হয়েছে এদের মধ্যে অসংখ্য সংকর। তারপরেই পাওয়া গেছে একটি সফল ধান। আজ যদি নতুন প্রয়োজনে নতুন গুণ সম্পন্ন ধান প্রয়োজন হয় তখন প্রকৃতিতে ঐ গুণগুলো আর খুঁজে পাব কি?

সাম্প্রতিক কালে বিপদের আশংকাটি বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন আর তা পেরেছেন বলেই এখনো নানা ফসলের যে সব জাত-বৈচিত্র্য অবশিষ্ট রয়েছে সেগুলো অন্তত নমুনা হিসেবে হলেও সংরক্ষণ করে রাখার চেষ্টা নিয়েছেন। যেমন পেরুতে অবস্থিত আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্রের কথাই ধরা যাক। সেখানে সংরক্ষিত হয়েছে ৪,১০০ বিভিন্ন ধরনের আলু-বীজ। যে ফসলের অধিক বৈচিত্র্য যে সব অঞ্চলে ছিল, এখন যা বিলুপ্তির সম্মুখীন, সেগুলো নির্ধারণ করে সেখানে ব্যাপক সংগ্রহ ও সংরক্ষণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

১৯৭৪ সন থেকে রোমে এফ. এ. ও-র প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ বংশগতি সম্পদ বোর্ড (আই. বি. পি. জি. আর) কাজ করে যাচ্ছে। এর লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ ফসলসমূহের যত বেশি সম্ভব বিচিত্র বংশগতিক ধারা রক্ষা করা। এটি গড়ে তুলছে বংশগতিক গুণাগুণের আন্তর্জাতিক ভাণ্ডার-জিন-ব্যাংক। জীবের কোষে রয়েছে জিন কণিকার সূত্র যার মধ্যে ডি. এন. এ অণুর ভাষায় লেখা আছে এ জীবের যাবতীয় গুণাগুণ। জিনের সংরক্ষণ মানে হল এ সব গুণাগুণের সংরক্ষণ যা বংশ-পরম্পরায় সঞ্চারিত হতে পারে পরবর্তী প্রজন্মগুলোর মধ্যে। এ জন্যই জিন ব্যাংক। যে সব জাতের চাষ এক সময় করা হয়েছে, এখনো কোথাও কোথাও হচ্ছে এবং যে সব জাত এখনো বন্যভাবে অবশিষ্ট রয়েছে সেগুলোর বীজ সংগ্রহ করেই চলছে এ কাজ।

কাজটি এত ব্যাপক যে রীতিমত গবেষণা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে না এগুলে এটি দক্ষভাবে সম্পাদন করা অসম্ভব। এই বিশাল বিশ্বের প্রতি জনপদে যদি একটি শস্যের জাত-বৈচিত্র্য খোঁজ করতে হয় তা হলে কূল পাওয়া যাবে না। তাই সংগ্রহ অভিযান তীব্র করতে হয় যেখানে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা বেশি সেখানে। ল্যাবরেটরির গবেষণা অনেক সময় এ কাজে সহায়তা দিয়ে থাকে। জীবকোষের ক্রোমোজম থেকে বিশেষ কৌশলে ডি. এন-এর অংশ বিশেষ কর্তন করে সেগুলোকে ইলেক্ট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে কতগুলো ব্যান্ডরূপে চাক্ষুষ করা যায়। যে সব নমুনার জিন-বৈশিষ্ট্য এক রকম তাদের জন্য এই ব্যান্ডও সদৃশ্য প্রকৃতির হবে। এভাবে খুঁজে নেওয়া যাচ্ছে সত্যিকার অর্থে বৈচিত্র্য রয়েছে কোথায়—আর সেখানেই কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব হচ্ছে প্রচেষ্টাকে।

যেমন পিসাম প্রজাতির মটর শুঁটির বৈচিত্র্য পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ইউরোপের প্রায় সর্বত্র এর বৈচিত্র্য খুব কম। কিন্তু তুরস্কের পশ্চিম অঞ্চল থেকে আনা নমুনার মধ্যে যথেষ্ট জেনেটিক বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। ফলে এর সংগ্রহ অভিযান কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে তুরস্কে এবং এর সংলগ্ন সোভিয়েত ইউনিয়নের অঞ্চলগুলোতে।

জিন ব্যাংকের জন্য সংগ্রহের সময় লক্ষ্য থাকে যত বেশি সম্ভব বংশগতির বৈচিত্র্য যেন এই সংগ্রহে ধরা যায়। বীজের চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই এদের মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য থাকছে কিনা। তাই সংগ্রাহক যখন বীজ সংগ্রহ করেন তখন তিনি এমন ইতস্ততভাবে বীজ নেন যাতে সর্বাধিক সংখ্যক বৈচিত্র্য আসার সম্ভাবনা বাড়ে। কয়েক কদম গিয়ে কিছু বীজ নিলেন এখান থেকে, আবার ওখান থেকে এমনি করে। আবার তাঁকে কড়া নজর রাখতে হয় বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য কোন গাছের কোথাও দেখা যাচ্ছে কিনা তা দেখতে। যেমন একই মাপের গাছের ভুট্টা ক্ষেতে কোন গাছকে খুব বেঁটে দেখা গেল, কিংবা খুব লম্বা, অথবা ভুট্টার মধ্যে খানিকটা ভিন্ন রং দেখা গেল। অথবা ধরা যাক সংগ্রাহক ঘাসের বীজ সংগ্রহ করছেন। যেখানে পশুরা চলাচল করছে, ঘাস খাচ্ছে সেখান থেকে ও বীজ নেয়া উচিত হবে। কারণ তা হলে এমন বৈশিষ্ট্যের ঘাসের বীজ হয়তো পাওয়া যাবে যা পশুতে মাড়ালে খাড়া থাকে কিংবা অনেকখানি গোবর সারের মধ্যেও টিকে থাকে।

যে সব জায়গায় জলবায়ু, ভূমি ব্যবহার ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটছে সেখান থেকে বীজ সংগ্রহের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ এসব পরিবর্তন হয়তো ওখানকার এমন কিছু বংশগতি বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে দেবে যা আর কোনদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না। তুরস্কের একটি পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পের ফলে সেখানকার একটি বিশাল জায়গা পানিতে ডুবে যাওয়ার কথা ছিল। ব্যাপারটি ঘটার ঠিক আগে জিন ব্যাংকের সংগ্রাহকরা সেখানকার বিভিন্ন লেগুম ও পশুখাদ্য ঘাসগুলোর বীজ সযত্নে সংগ্রহ করে এনেছিলেন।

যে সব ক্ষেত্রে বীজ নয় গছের অন্য অংশ থেকে বংশ বিস্তার ঘটে সেখানে অবশ্য সংগৃহীত অংশের মধ্যেই বেশ খানিকটা বৈচিত্র্য ধরা পড়তে পারে। যেমন বীজ আলুর চেহারা দেখেই বোঝা যায় ওটা অন্য বীজ আলু থেকে কতখানি ভিন্ন।

সংগৃহীত বৈচিত্র্যের পরিমাণ বিপুল, এদের সবগুলোকে সংরক্ষণের মত ব্যবস্থা কোন জিন ব্যাংকেই থাকে না। তাই এদের মধ্যে অগ্রাধিকারের প্রশ্ন রয়েছে। স্পষ্টত গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার ফলে ভবিষ্যতে পৃথিবী পৃষ্ঠের উত্তাপ ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে। আজ উষ্ণমণ্ডলীর অঞ্চল বলতে যেটাকে বুঝি পরে তা আরও অনেক বিস্তৃত হবে। তাই বিজ্ঞানীরা মনে করেন উষ্ণমণ্ডলের উপযুক্ত বীজগুলোই সংরক্ষণ করতে হবে অধিক গুরুত্ব দিয়ে। সংরক্ষণের ব্যাপারটিও নেহাৎ সহজ নয়। প্রত্যেকটি নমুনার বিস্তারিত পরিচয়ের রেকর্ড সঙ্গে রাখতে হয়। আরো অন্যান্য ব্যাপারও রয়েছে। যেমন লেগ্যুম অর্থাৎ শিম ও ডাল জাতীয় উদ্ভিদের অবস্থান সব সময়ই বিশেষ ধরনের নাইট্রোজেন সংগ্রাহক জীবাণুর সঙ্গে থাকে। কাজেই এর সংগ্রহের সঙ্গে ঐ জীবাণুকেও থাকতে হয়। কোন বীজকে অনির্দিষ্টকাল ধরে জমিয়ে রাখা যায় না। মাঝে মাঝে তাই এদের অংকুরোদ্‌গম ও উদ্ভিদ গজিয়ে আবার নতুন প্রজন্মের বীজ সংগ্রহ করে রাখতে হয়।

আলো, অক্সিজেন আর পানি থেকে বঞ্চিত করলে বীজ অনেক দিন সুপ্ত থাকতে পারে। জৈব রাসায়নিক যে প্রক্রিয়া বীজকে বাঁচিয়ে রাখে তা তখনো বজায় থাকে, কিন্তু তা চলে অতি ধীরে ক্ষীণ ধারায়। তবে সর্বোচ্চ কতদিন সুপ্ত থাকতে পারে একটি বীজ? বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে বীজকে যদি শুকিয়ে মাত্র পাঁচ শতাংশ পানি থাকা অবস্থায় নিয়ে আসা হয় এবং তা—২০° সেলসিয়াসে ঠাণ্ডা করে রাখা হয় তা হলে বীজ অন্তত ১৫ বছর টিকে থাকবে, হয়তো বা দু'শ বছরেও তার কিছু হবে না। আরো ভাগ্যের কথা যে পৃথিবীর যাবতীয় উদ্ভিদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগের বীজ এ রকম শুকানো এবং হিমায়নের ধকল সহ্য করতে সক্ষম। বাকি ২০ ভাগের কথা অবশ্য ভিন্ন। বীজকে যত শুকানো যাবে আর উত্তাপ যত কমানো যাবে, বীজের টিকে থাকার সময় তত বাড়বে। একটি মোটামুটি নিয়ম হল প্রতি ৫° সেঃ উত্তাপ কমানোর জন্য সংরক্ষিত বীজের আয়ু দ্বিগুণ হয়, তেমনি প্রতি ২ শতাংশ আর্দ্রতা কমানোর জন্যও আয়ু দ্বিগুণ হয়।

এ সব কথা অবশ্য সেই বীজের জন্যই খাটে যা সংগ্রহের সময় সম্পূর্ণ সুস্থ-সবল ছিল। কিন্তু একটি বীজ ভাল অবস্থায় আছে কিনা তা এমনিতে জানা বড় দুরূহ। একমাত্র অংকুরোদগমের মাধ্যমেই তা জানা সম্ভব। কিন্তু কোন বীজ অঙ্কুরোদ্‌গম করতে ব্যর্থ হলে তখনো বোঝার উপায় নেই সেটি ঐ প্রক্রিয়াতেই নষ্ট হয়েছে না আগে থেকেই এটি খারাপ ছিল। অবশ্য কিছু কিছু পদ্ধতি রয়েছে যার মাধ্যমে চারা না গজিয়েই বীজের অবস্থা কিছুটা আঁচ করা যায়। টেট্রাজোলিয়াম নামে এক রকম বর্ণহীন লবণ রয়েছে যা ডিহাইড্রোজেনেস এনজাইমের সংস্পর্শে আসলে রক্ত বর্ণ ধারণ করে। বীজকে এর সংস্পর্শে আনলে এভাবে বীজের মধ্যে ঐ এনজাইমের উপস্থিতি ধরা পড়ে, যা জীবন্ত থাকার একটি অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। তা ছাড়া বীজের উপর ছাতা পড়ছে কিনা তাও বীজ জীবিত না মৃত তার আভাস দিতে পারে। মৃত বীজের উপর ছত্রাকের আবাস সহজে গড়ে ওঠে, সুপ্ত বীজে তা হয় না। এগারের পাত্রে কয়েক দিন রাখা হয়েছে এমন বীজকে সজোরে চাপ দিলে যদি তা প্যাঁজা ছোবড়ার মত হয়ে উড়ে যায় তা হলে বুঝতে হবে বীজটি গোড়াতেই মৃত ছিল। কিন্তু এ সব পরীক্ষা করতে গিয়ে ভাল বীজকেও নষ্ট

করে ফেলতে হয়। যার সামনে বিলুপ্ত প্রায় জাতের অল্প কয়েকটি বীজ মাত্র রয়েছে তার সাহস হবে না এমন সব পরীক্ষার শরণাপন্ন হতে, অথচ বীজগুলো জীবিত কি মৃত তা না জানলেও উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হয়।

আমাদের দেশে কৃষক যখন বীজ বোনেন তার আগে বীজগুলো ভাল কিনা সেটি পরীক্ষা করার জন্য অংকুরোদ্‌গম হার দেখতে পরামর্শ দেওয়া হয়। ১০০টি বীজকে অংকুরিত করার চেষ্টা করে তার মধ্যে কতটিতে সফল হওয়া গেল সেটিই এই হার। জিন ব্যাংককেও শেষ পর্যন্ত এই পদ্ধতিরই শরণাপন্ন হতে হয়। আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ বংশগতি সম্পদ বোর্ডের নীতি হচ্ছে প্রত্যেক জিন ব্যাংক তার প্রত্যেকটি বীজ সংগ্রহকে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অংকুরোদ্‌গম হার পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই পরীক্ষায় অন্তত শতকরা ৮৫ ভাগ বীজ অংকুরিত না হলে সেই বীজ থেকে সংগ্রহের জন্য নতুন বীজ সৃষ্টি করতে হবে।

বিশ্বের ভবিষ্যৎ খাদ্য-শস্যের চাবিকাঠি রয়ে গেছে এই জিন ব্যাংকে। এতই গুরুত্বপূর্ণ যে-ই ব্যাংক তার আয়োজন দেখলে খুব একটা চমৎকৃত হবার কারণ নেই। সাধারণ একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গেও তুলনা করা যাবে না এর আয়োজনকে। 'ব্রাসিকা' গোষ্ঠীর সব্জি অর্থাৎ ফুল কপি, বাঁধা কপি, সবুজ কপি ইত্যাদির বংশগতি সংরক্ষণের বিশ্ব দায়িত্ব রয়েছে ইংল্যান্ডের ওয়েলেসবোর্নে একটি জিন ব্যাংকের উপর। তা ছাড়া 'এলিয়াম' গোষ্ঠীর উদ্ভিদও রয়েছে এর দায়িত্বে যার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হল পেঁয়াজ। এই জিন ব্যাংকটির কি চেহারা দেখা যাক।

ব্যাংকটির পরিচালক এবং দু'জন সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা—এই হল সর্ব সাকুল্যে বিশেষজ্ঞ জনশক্তি। তাঁদেরকে নানা জায়গা থেকে সংগ্রাহকরা নিয়মিত বীজ পাঠান। সংগ্রাহক কারা? তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দেশ বিদেশের সৌখিন বাগান রচয়িতা, বীজ সংস্থা এবং প্রেরিত সংগ্রাহক দল। বীজগুলো ব্যাংকে পৌঁছলে তাঁরা তিন জন কাজে লেগে যান ১৫° সেঃ এর মত উত্তাপ ও ১৫ শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতাবিশিষ্ট ঘরে রেখে বীজকে শুকাতে। তাঁরাই বীজকে পরিষ্কার করেন, ওজন করেন, প্লাস্টিকের লাইনিং দেয়া ধাতু পাতের প্যাকেটে এদের সিল করে—২০° সেঃ উত্তাপে রাখা ড্রয়ারগুলোতে সাজিয়ে রাখেন। তাঁরাই শুরুতে যেমন অংকুরোদ্‌গমের পরীক্ষা চালান এদের উপর, তেমনি চালিয়ে যান পাঁচ বছর অন্তর অন্তর। আর একজন সহকারী আছেন যাঁর দায়িত্ব হচ্ছে যে সব বীজ-সংগ্রহের পুনঃ রোপণের মাধ্যমে নবায়ন প্রয়োজন তা সম্পন্ন করা। প্রতি বছর গড়ে এ রকম ৩০০টি সংগ্রহের নবায়ন করতে হয় চাষের মাধ্যমে। লোক বল আর আয়োজনের অভাবে প্রায়ই সময়মত সব বীজের ক্ষেত্রে এটি করা হয়ে উঠে না।

এই জিন ব্যাংকে অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে এ পর্যন্ত কোন সংগ্রহের অংকুরোদগম ক্ষমতা গুরুতরভাবে কমে যায় নি। তবুও মাঝে মাঝে চাষের মাধ্যমে নবায়নের প্রধান কারণ হল মূল সংগ্রহগুলোতে বীজের পরিমাণ কমে আসে বলে, সেটি বাড়িয়ে নেওয়া। বীজের পরিমাণ কমে আসে বলে, সেটি বাড়িয়ে নেওয়া। বীজের পরিমাণ কমে গেলে বৈচিত্র্যের ভাণ্ডারেও টান পড়ে। একে কিছুতেই অতিরিক্ত কমে

যেতে দেয়া যায় না। অন্যত্র থেকে আনা বীজ থেকে নতুন চাষ সব সময় সহজ হয় না বিজাতীয় পরিবেশে। তবুও গ্লাস-হাউসে তাপ, আর্দ্রতা, আলো ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে যথাসম্ভব অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়।

উদ্ভিদ জগতের যে শতকরা বিশ ভাগ বীজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় না সেগুলোর জন্য পন্থা প্রয়োজন। এই দলের মধ্যে রয়েছে আম, নারকেল, রাবার, কোকো, ওক ইত্যাদি অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষ। এদের বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে পারাটাও জরুরি এবং সে জন্য নিতে হচ্ছে ভিন্নতর পদক্ষেপ। এর একটি উপায় হল প্রকৃতির মধ্যেই উদ্ভিদটির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। বিরল পশু পাখির জন্য যে রকম অভয়ারণ্যের সৃষ্টি করা হচ্ছে, এও উদ্ভিদের জন্য সে রকম অভয়ারণ্য। হাজার হাজার বছর ধরে এই সব গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ যেভাবে প্রকৃতিতে তাদের বন্য জ্ঞাতিদের পাশাপাশি বংশ পরম্পরায় বেঁচে থেকেছে, বিবর্তিত হয়েছে—সেই প্রক্রিয়াকেই বিশেষ ব্যবস্থাধীনে অব্যাহত রাখা। বেশ কিছু দেশ এ রকম সংরক্ষণের আয়োজন করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ককেশাস পর্বতে গম আর বিভিন্ন ফলের বন্য জ্ঞাতিদের রক্ষার জন্য অভয়ারণ্য সৃষ্টি করা হয়েছে, আর ইরান সীমান্তের উত্তরে কোপেট পর্বতে এটি করা হয়েছে বাদাম, পেস্তা আর খুবানির জন্য। ভারতে এ সম্পর্কে প্রথম পদক্ষেপ ঘটেছে গারো পাহাড় অঞ্চলে কমলার অন্যান্য সাইট্রাস জ্ঞাতিদের রক্ষার্থে। আন্তর্জাতিক সংস্থার উৎসাহ পেয়ে পৃথিবীর বহু দেশেই বহু সংরক্ষিত অঞ্চলকে এভাবে অভয়ারণ্য রূপী জিন ব্যাংক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৮৮ সালের মধ্যে ১২৫টি দেশে এ রকম ৩,৫০০টি সংরক্ষিত এলাকার সৃষ্টি হয়েছে যার সম্মিলিত আয়তন ৪০ লক্ষ হেক্টর। ১৯৭৪ সন থেকে শুরু করে ইউনেস্কো ৭০টি দেশে ২৫৯টি সংরক্ষিত এলাকাকে 'বায়োস্ফেয়ার রিজার্ভ' অর্থাৎ 'জৈববিশ্ব অভয়ারণ্য' হিসেবে গ্রহণ করেছে যা এই আন্তর্জাতিক সংস্থার 'মানব ও জৈব বিশ্ব' কর্মসূচির অংশ। সংরক্ষিত বীজের জিন ব্যাংক এবং অভয়ারণ্যের প্রাকৃতিক জিন-ব্যাংক এই উভয়ের সম্মিলিত অবদানই বিশ্বের জৈব-বৈচিত্র্যকে ভবিষ্যতের জন্য রক্ষা করতে পারবে এটিই এখন অধিকাংশের অভিমত।

অনেক প্রজাতির উদ্ভিদের জন্য অভয়ারণ্যের জিন ব্যাংকের একটি সহজতর সংস্করণ হতে পারে মাঠ-জিন ব্যাংক। প্রকৃতির হাতে ছেড়ে না দিয়ে এখানে পরিকল্পিত বাগান সৃষ্টির মাধ্যমে মাঠেই সংরক্ষণ চলতে পারে বছরের পর বছর। যে সব বীজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় না সেগুলোতো বটেই যে সব ক্ষেত্রে সাধারণত বংশ বিস্তার ঘটে বীজের মাধ্যমে নয়, অঙ্গজ প্রজননের মাধ্যমে সেক্ষেত্রেও পদ্ধতিটি সুবিধাজনক। আলু, মিষ্টি আলু, কাসাভা, ইয়াম, আখ-এ সব গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য-উদ্ভিদ এই দলে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ পেরুতে অবস্থিত আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্রে ৪,১০০ বিভিন্ন জাতের বীজ-আলু (অঙ্গজ) সংগৃহীত রয়েছে। এদের প্রত্যেকটিকে প্রতি বছর মাঠে লাগিয়ে নতুন করে বীজ-আলু সংগ্রহ করে রাখা হয়। এ রকম কাজের জন্য প্রচুর জমি এবং শ্রম-শক্তি প্রয়োজন সন্দেহ নেই, কিন্তু এটিই নিরাপদ ব্যবস্থা।

মাঠ জিন ব্যাংকে অঙ্গজ প্রজনন ঘটলে প্রত্যেকটি মূল জাতের বিশুদ্ধ বংশরক্ষার কাজটি সেখানে সম্পন্ন হয়। কিন্তু জিন-ব্যাংকের লক্ষ্য হল যত বেশি সম্ভব বৈচিত্র্যকে

ধারণ করা—সত্যিকার বীজের মধ্যে সেই বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা অনেক বেশি। তাই যেখানে সম্ভব অঙ্গজ প্রজননের সাহায্যে মাঠে সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বীজ সংগ্রহ করে তা সাধারণ জিন ব্যাংকেও সংরক্ষণ করা হয়। যেমন আলুর ক্ষেত্রে এটি করা হচ্ছে।

যে সব বীজ সংরক্ষণ করা যায় না তাদের ক্ষেত্রে উদ্ভিদকে অভয়ারণ্যে অথবা বাগানে স্বাভাবিক বৃদ্ধির মাধ্যমে টিকিয়ে রাখা ছাড়া উপায় নেই। সেটি বড় আয়োজনের ব্যাপার। তাই বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন বীজের বদলে সেগুলোর অন্য কোন অংশ সংরক্ষণ করা যায় কিনা। বায়োটেকনোলজীর আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে টিশ্যু কালচারের মাধ্যমে এটি সম্ভব হতে পারে। এ ক্ষেত্রে টিশ্যু কালচারের সবচেয়ে উপযোগী হয় উদ্ভিদের কাণ্ড-মুকুল অথবা ভ্রুণটি জিইয়ে রাখার ব্যবস্থা করা। দু'ভাবে এদের সংরক্ষণ করা যায়। একটি হচ্ছে বৃদ্ধির গতি অনেক ধীর করে দিয়ে। দেখা গেছে যে পুষ্টি সমৃদ্ধ এগারের উপর যখন উদ্ভিদের এ সব অংশের কোষকলা বেড়ে ওঠে সেই বৃদ্ধিকে নিম্ন উত্তাপ এবং কিছু দ্রব্যের সংযোগে মন্থর করে দেয়া যায়। আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্রে ৩,৪০০ রকমের আলুকে এভাবে সংরক্ষিত করা হয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য আরো সম্ভাবনাময় পদ্ধতি হতে পারে হিমায়নের মাধ্যমে কোষকলাকে সংরক্ষণ করা। হিমায়ন কোষ কলার বৃদ্ধিকে একেবারে স্তব্ধ করে রাখে; পরে যথাযথভাবে উত্তাপ বাড়িয়ে নিয়ে এর থেকে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উদ্ভিদটি পাওয়া সম্ভব। নিয়মিতভাবে এ পদ্ধতি চালু করা গেলে অপেক্ষাকৃত সহজে ও সস্তায় সেই সব উদ্ভিদের জিন সংরক্ষণ সম্ভব হবে, যাদের বীজ বেশিদিন টেকানো যায় না।

একটি উদাহরণ নেওয়া যাক যার থেকে বোঝা যাবে কিছু কিছু জরুরি উদ্ভিদের সংরক্ষণে সমস্যাগুলো কি রকম। নারকেল এমন একটি জিনিস যা নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করে এনে সংরক্ষণ করা সত্যিই কঠিন। এর বীজ খুব বড়, ভারী এবং স্বল্পস্থায়ী। অধিক সংখ্যায় এদেরকে দূরে পরিবহন করে ব্যাংকে নেওয়া যেমন কঠিন, তেমনি এর বীজকে বেশি দিন সংরক্ষণও অসম্ভব। তাই উদ্ভাবিত হয়েছে নতুন পদ্ধতি। এতে নারকেল সংগ্রাহক ছোবড়া ছিলে এর শাঁসের সেই অংশটুকু কেটে নেবেন যেখানে ভ্রুণটি রয়েছে। নারকেলের ভ্রুণটি অপেক্ষাকৃত বড় হলেও এটি এক সেন্টিমিটার লম্বা একটি পেন্সিলের আকৃতি বই নয়। কেটে নেয়ার পর নির্বীজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এর সঙ্গে সংযুক্ত কোন জীবাণু বা ছত্রাক থেকে থাকলে তা দূর করা হয়। এ অবস্থায় কাচ পাত্রে নির্বীজিত পানির মধ্যে বন্ধ করে ভ্রুণগুলোকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় জিন-ব্যাংকে। সেখানে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে ভ্রুণ থেকে নতুন চারা গজিয়ে তা মাঠ-জিন ব্যাংকে স্থাপন করা হয় পরবর্তী প্রজন্ম পাওয়ার জন্য। অবশ্য চেষ্টা থাকছে ভ্রুণকে সরাসরি না গজিয়ে দীর্ঘদিন সংরক্ষিত করা যায় কিনা দেখতে। অপেক্ষাকৃত বড় বলেই হয়তো হিমায়ন পদ্ধতির সংরক্ষণ এ পর্যন্ত নারকেলের ভ্রুণের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আশু সাফল্য সম্বন্ধে আশাবাদী।

উদ্ভিদ যখন বন্যভাবে উঠে তখন প্রাকৃতিক নিয়মেই এর মধ্যে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টির সুযোগ থাকে। যা সংগৃহীত হচ্ছে সে সব বৈচিত্র্য এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। সংগ্রহের বাইরে প্রকৃতিতে এ জাতের উদ্ভিদ যদি না থাকে তা হলে ভবিষ্যতে নতুন বৈচিত্র্য সৃষ্টির

ভার পুরোপুরি বর্তাবে উদ্ভিদবিদদের হাতেই। ভবিষ্যতের আবহাওয়া আর প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে তাল রেখে এ কাজ করা অত্যন্ত গুরুদায়িত্ব বৈকি।

পৃথিবীতে রয়েছে উচ্চ পর্যায়ের মোট আড়াই লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ। এর মধ্যে শতকরা মাত্র দশভাগকে বিজ্ঞানীরা সামান্য পরীক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। আর বিশদভাবে গবেষণা হয়েছে পাঁচ হাজার প্রজাতির উপর। তবে মানুষের পুষ্টির শতকরা ৯৫ ভাগ আসে মাত্র ৩০টি উদ্ভিদ থেকে। স্বাভাবিকভাবেই এই ৩০টির উপরেই জিন ব্যাংকের এ যাবত যত গুরুত্ব আরোপ ঘটেছে। তবে ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এই কর্ম প্রচেষ্টাকে বিস্তৃত হতে হচ্ছে ৩০টি উদ্ভিদ ছাড়িয়েও আরো অনেক ব্যাপক পরিসরে। জিন ব্যাংকের তৎপরতা না ঘটলে অনেক স্থানীয় অথচ সম্ভাবনাময় খাদ্য শস্য শিগগির চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমাদের দেশে ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান ধানের বিভিন্ন স্থানীয় জাত এবং অন্যান্য কিছু প্রতিষ্ঠান অন্যান্য ফসলের জাত সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। তবে এ সব জিন-ব্যাংকের আরো অনেক বেশি তৎপরতার প্রয়োজন রয়েছে।

দক্ষিণ আমেরিকার এন্ডিজ অঞ্চলে এমন কিছু শস্য এবং মূল ও কাণ্ড জাতীয় উদ্ভিদ রয়েছে যা বহির্বিশ্বে অজানা। তেমনি পূর্ব আফ্রিকায় অন্তত ২০টি বিভিন্ন তৈলবীজ রয়েছে যার খবর অনেকেই জানে না। আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলে সাম্প্রতিক কালের দীর্ঘ খরায় নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হয়েছে ৩০ প্রজাতির গাছ ও ঝোপ জাতীয়, ৩০ প্রজাতির ঘাস এবং আরো ১২ প্রজাতির লেগ্যুম জাতীয় পশু-খাদ্যোপযোগী উদ্ভিদ। এগুলো সংরক্ষিত না হলে পরে সারা দুনিয়া দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই সাহেল অঞ্চলকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে সংগ্রহের দিক থেকে গুরুত্বহীন মরু অঞ্চল। কিন্তু ভবিষ্যতের উষ্ণতর দিনগুলোর কথা যদি ভাবি তা হলে দেখবো সেখানে রয়েছে বিশ্বের নানা অঞ্চল জুড়ে আরো বড় এক সাহেল যে সব প্রজাতি ও জাত আজ সাহেলে পাওয়া যাচ্ছে এগুলোর অনেকেই হয়তো ভবিষ্যতের জন্য যথাযথ। কাজেই আজ নিশ্চিহ্ন হবার আগে প্রকৃতির এই সহিষ্ণু সন্তানগুলোকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন আমাদের সবার স্বার্থে।

ISBN 984 458-347-0